রেণুর আবির্ভাব

রেণুর আবির্ভাব

হারুন আল রশিদ

অনন্যা

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ২০২১

প্রকাশক
মনিরুল হক
অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা
anannyadhaka@gmail.com
www.ananya-books.com

© লেখক

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

অক্ষর বিন্যাস
তন্বী কম্পিউটার
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
পাণিনি প্রিন্টার্স
১৪/১ তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা

দাম : ৩২৫.০০ টাকা

ISBN 978-984-95843-4-6

Renur Abirbhab by Harun Al Rashid
Published by Monirul Hoque, Ananya, 38/2 Banglabazar, Dhaka-1100
First Published : October 2021, Cover Design : Dhrubo Esh
Price : 325.00 Taka Only

U.S.A. Distributor ❑ **Muktadhara**
37-69, 74 St. 2nd Floor, Jackson Heights, N.Y. 11372

Kolkata Distributor ❑ **Naya Udyog**
206, Bidhan Sarani, Kolkata-700006, India

ঘরে বসে **অনন্যা**'র বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/ananya

উাৎসার্গ

স্বপ্নিল

–মেয়ে আমার, তাকাও। এখন, এখানে।

প্রাক-কথন

উপন্যাস হুবহু জীবন নয়, তবে জীবনের দর্পন অবশ্যই। আবার তার নির্মাণও নানারকম। ‘রেণুর আবির্ভাব’ বাস্তবতা ও কল্পনার মিশ্রণে তেমনি এক উপন্যাস যা বিন্যাসে, প্রকরণে ও বাণীতে অভিনবত্বের ইশারা দেয়। লেখক হারুন আল রশিদ এই কাজটি খুব সচেতনভাবে করেছেন বলে মনে হয়।

বেশ সাহসীও বটে এই কথক। কারণ এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র শেখ মুজিব ও রেণু। বাইশ বছরের মুজিব ও বারো বছরের রেণুর জীবনের একদিনের ঘটনাবলি নিয়ে জেমস জয়েসের একটি বহুখ্যাত উপন্যাস ‘ইউলিসিস’-এর কাঠামোতে লেখা হয়েছে এই উপন্যাস। লেখক বলেছেন, ১৯৪২ সালে ফুলশয্যা হয় দুজনের।

বঙ্গবন্ধুর ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’তে এই তথ্য আছে বলে তিনি জানিয়েছেন। অনেকে দিনটিকে আবার ‘গুড ফ্রাইডে’ বলে বর্ণনা করেছেন। পুরো দিনটি যাপনের আদ্যোপান্ত বিবৃত করেই লেখক শেষ করেছেন এই কল্প-বাস্তব। উপরন্তু শেখ মুজিব কিভাবে একজন অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে বেড়ে উঠেছেন, তারও নানা পর্যায়ক্রমিক বিন্যাসে রূপ পেয়েছে উপন্যাসের মূল থিম। যেন এক বায়োস্কোপ, একটার পর একট ছবি ভেসে উঠছে। তবে কালানুক্রমিক নয় এ বর্ণনা।

বরং বলা যেতে পারে অতীত ও বর্তমানের সমান্তরাল যাত্রার পাশাপাশি ভবিষ্যতকে আভাসিত করার অভিনব প্রয়াসও বেশ কৌতূহল জাগায়। রেণুর জন্ম, তাঁর বাবার মৃত্যু, মুজিবের বেরিবেরি, শেরেবাংলা ও সোহরাওয়ার্দির সঙ্গে সাক্ষাৎ থেকে শুরু করে জীবনপঞ্জির আরো অনেক ঘটনা যেন টাইম মেশিনে চড়ে একবার সামনে একবার পেছনে চলে যেতে থাকে। ইতিহাস যেমন আছে কম্পাসের মতো, তেমনি আছে নাটকীয়তার কল্পচিত্রও। শেষ দৃশ্যে আছে বাসর রাতের নান্দনিক সুন্দরের অনবদ্য বুনন।

‘রেণু এত কাছে। তাই ঘুমোতে যাওয়ায় বুঝি এত আনন্দ। আমি ঘুমকে বরণ করি।’ লেখকের ভাষা যেমন সহজ, তেমনি বহুবর্ণিল। আর তাতে আছে অনেক দৃশ্যের উঁকিঝুঁকি। ফলে এক পাঠে ফুরোয় না এই কথকতা, যেমন ফুরোয় না কোনো বহুতলীয় কবিতা। তাই শেষ হয়েও অশেষ এই পাঠ। এই উপন্যাস পাঠপ্রিয়তা পাবে, এই আমাদের বিশ্বাস।

মুহম্মদ নূরুল হুদা
ঢাকা
০৭.১০.২০২১

ভূমিকা

রেণুর আবির্ভাব উপন্যাসে ১৯২০ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের একটা সাহিত্য-রূপ প্রদান করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু তাঁর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'-তে ২১ নম্বর পৃষ্ঠায় লিখেছেন, '১৯৪২ সালে আমাদের ফুলশয্যা হয়।' বঙ্গবন্ধুর বৃহত্তর পরিবারের এক জন সদস্যের কাছ থেকে আমি জেনেছি ওই দিনটি ছিল গুড ফ্রাইডে। বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতার বাসর সম্পর্কে আর তেমন কোনও বিশেষ তথ্য আমি পাইনি। যদিও তাঁদের বাসরের দিন ও স্থানে 'রেণুর আবির্ভাব' উপন্যাসটি গ্রথিত।

ইতিহাসের সচেতন প্রয়োগ সত্ত্বেও এটা মূলত একটি পরিবারের গল্প যার নির্মাণে কল্পনা ছিল প্রধানতম রসদ। বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' এ গল্পের কম্পাস, সে সাথে বাংলাদেশের রাজনীতির মঙ্গলতম ধারাটিও। বঙ্গবন্ধু-বঙ্গমাতা দম্পতির জ্যেষ্ঠ কন্যা শেখ হাসিনার প্রবন্ধসমূহ ও সাক্ষাৎকারসমূহ এবং কনিষ্ঠ কন্যা শেখ রেহানার কিছু লেখা কিছু সাক্ষাৎকার ছাড়াও ড. নীলিমা ইব্রাহিম-এর 'বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব', বেবী মওদুদ-এর 'শেখ মুজিবের ছেলেবেলা', নাছিমা বেগম-এর 'রেণু থেকে বঙ্গমাতা' গ্রন্থ থেকে এই উপন্যাসের জন্য তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে। এঁদের প্রত্যেকের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা।

বঙ্গবন্ধু এবং বঙ্গমাতা জীবনের যে গভীরতায় পৌঁছেছেন, তা মানুষের ভেতরের শক্তির আবিষ্কার এবং সে শক্তির ব্যবহারের সক্ষমতা অর্জন ছাড়া সম্ভব নয়। যাঁরা অন্তর্জাগতিক গুরু হিসাবে বতর্মান সময়ে সুপরিচিত তাঁদের প্রশিক্ষণের মূলমন্ত্র এ উপন্যাসে ব্যবহার করা হয়েছে। কৃতজ্ঞতার সাথে তিন জনের নাম উল্লেখ না করলেই নয়। তাঁরা হলেন Eckhart Tolle, Thich Nhat Hanh, Jon Kabat-Zinn।

উপন্যাসটির রচনা-কালে আমার মনে অনেক প্রশ্ন এসেছে যার উত্তর সংগ্রহ করতে পারিনি অথচ যে তথ্যসমূহ উনস্যাসটিকে অধিকতর সমৃদ্ধ করতে পারত। এই ব্যর্থতার জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। রাজনীতিবিদ ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন শিক্ষা মন্ত্রী জনাব শেখ শহীদুল ইসলাম আমাকে কিছু দুর্লভ তথ্য প্রদান করেছেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী সাজ্জাদ আলী জহির, বীর প্রতিক, প্রথম অধ্যায় পড়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

স্বনামধন্য কবি, বুদ্ধিজীবী ও বাংলা একাডেমির মহাপরিচাল মুহম্মদ নূরুল হুদা এই গল্পের একটি প্রাক-কথন লিখে আমাকে বিশেষভাবে ধন্য করেছেন। কবির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা রইল।

বাংলাদেশের প্রকাশনা জগতের অন্যতম দিকপাল মনিরুল হক গ্রন্থটি প্রকাশ করে আমাকে চির-ঋণী করে রাখলেন।

এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা, এ কথা মাথায় রেখেই আমি প্রতিটি বাক্য রচনা করেছি। তারপরও এতে অনিচ্ছাকৃতভাবে উপস্থাপিত করা কোনও ঐতিহাসিক ভুল কারও চোখে ধরা পড়লে তা আমার বা প্রকাশকের নজরে আনলে কৃতার্থ হব, এবং তা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করতে আমরা

প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিনীত,

হারুন আল রশিদ
ঢাকা, অক্টোবর ২০২১।

গুড ফ্রাইডে, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ

রেণুর পরনে সবুজ শাড়ি। কোমর ঘিরে উঁচু ঘের। রেণুর চোখে ভার। যা আগে কখনও দেখিনি। রেণুকে কখনও দেখিনি এমন শক্ত হয়ে দাঁড়াতে। রেণুর গলার এমন কাঠিন্যও আগে দেখিনি। রেণু সহজে স্বাভাবিক হবে, এমনটা ভাবতে পারছি না। বিশেষ করে এমন একটা দিনে। যখন দুজন মানুষের জীবন চিরতরে বদলে দেয়ার জন্য সব আয়োজন চলছে। পণ্ডিতরা বলেন বাসর থেকে দুটি রাস্তা দুদিকে চলে গেছে। একটার গন্তব্য সুখ। একটার গন্তব্য দুঃখ। কে কোন গন্তব্যে পৌঁছবে, তা আগে থেকে বলা যায় না। মিশরে বিয়েকে নাকি তরমুজের সাথে তুলনা করা হয়। কেটে এক ফালি মুখে দেয়ার আগে যার স্বাদ বুঝার উপায় নাই।

তৃতীয় পক্ষ অবশ্য প্রথম গন্তব্যের বাইরে কিছু ভাবতে পারেন না, এমনকি নিজে সে গন্তব্যে পৌঁছতে না পারলেও। দ্বিধা আসে শুধু তাঁদের মনে, যাঁদের বাসর আসন্ন। আমাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু ভিন্ন। আমরা তা আনিনি। এটা মুরুব্বিদের আয়োজন।

এক ঝাপটা বাতাস গায়ে লাগে। রেণুর শাড়ির আঁচল ওড়ে। শাড়িতে ওকে ভালো মানিয়েছে। যদিও ওটা এখনও ওর নিয়মিত পোশাক হয়ে ওঠেনি। তবে সাদা পাজামা আর পাঞ্জাবি আমার জীবনের অংশ হয়ে গেছে অনেক আগেই। আমার অজান্তে।

আমি রেণুর দিকে তাকাই। আমার মাথায় একটা খেয়াল বাড়ি খায়। আমি আর একটু হ্রস্ব হলে বোধ হয় ভালো হতো। যদিও ছিপছিপে গঠন নিয়ে আমার নিজের কখনও কোনও অসুবিধা ছিল না। প্রকৃতির দানে আমাদের সন্তুষ্ট থাকা প্রয়োজন। তা ছাড়া আমরাতো প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসিনি। আমরা পৃথিবীতে এসেছি জীবনকে প্রকৃতির সাথে মিশিয়ে দিতে।

আব্বা আম্মা কেউ আমার লম্বা হওয়া নিয়ে কখনও অবাক হননি। তাঁরা

জানেন আমার ধমনীতে রয়েছে ফোরাত নদীর তীরের আর্য রক্ত। এখানে মার্জিনে একটা কথা বলে রাখা দরকার। আমি শুধু নৃতাত্ত্বিক অর্থে 'আর্য' শব্দটা ব্যবহার করি। হিটলারের বর্ণবাদ ইউরোপে যে বিপদ ডেকে এনেছে তা আজ গোটা মানবজাতির অস্তিত্বের সঙ্কটে রূপ নিয়েছে। পৃথিবীর মানুষকে সাম্প্রদায়িকতার কুফল শেখানোর জন্য তিনি একাই যথেষ্ট। তাঁর বিষে আমি আক্রান্ত নই। তাই 'আর্য' বলতে সাধারণ অর্থে যা বুঝায়, আমি তা মানি না। আমার পিতা-মাতা হয়তো তা মানেন। তাতে তেমন ক্ষতি নেই। তাঁরা সাদাসিধে পারিবারিক মানুষ। পূর্ব-পুরুষদের জমিদারিটা কাগজে-কলমে থাকলেও, আমাদের জমি তেমন অবিশষ্ট নেই। কাজেই তাঁদের আভিজাত্যবোধ বাইরের মানুষের জন্য হুমকি নয়। তবে আমি যে ও-সব মানি না, তা তাঁরা জানেন, আর আমার না-মানাকে তাঁরা মেনে নেন। সন্তানের প্রতি তাঁদের উদারতার জন্য আমি তাঁদের ভালোবাসি। আবার এটাও সত্য যে, নিজেকে আমি শুধু আমার চোখে দেখব, সে সুযোগ আমি হাতে রাখিনি। কাজেই আর দশ জনের দেখাটাও আমার কথায় মাঝে মাঝে উঠে আসবে। বিষয়টা জটিল, কৃত্রিমতা যেখানে ঢুকে যেতে পারে। তবে এ বিষয়ে আমি সতর্ক আছি। আদর্শের জগতে নিজেকে ফাঁকি দেয়ার মানুষ আমি নই। যে কাজ জাতি-ভাষা-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-ধনী-দরিদ্র সব কিছুর ভেদাভেদ গুঁড়িয়ে দেয়, সে কাজ আমার কাজ। সে কাজ আমার জীবনের ব্রত।

এ বিষয়ে আপাতত এটুকু। সময় গড়িয়ে যায়। রেণু ছড়ায় সুবাস। প্রাণের পরে বাসরের হাতছানি। যা জীবনে এক বার আসে। কোনও ওজর দিয়ে আমি তা খাটো করে দেখব না। আমার হাতে সুযোগ কিছু নাই। তবু রেণুর জন্য জীবনে একটা কিছুকে অমরত্ব দেয়ার বাসনা আমার রয়েছে। আর সে বাসনা আমি সহজে পরিত্যাগ করব না।

শুরু করা যাক সেই সুনির্দিষ্ট রক্ত-প্রবাহ থেকে, যে রক্ত বহনকারী মানুষের পা জ্বলেছে মরুভুমির বালুতে, মাথার তালু পুড়েছে কেন্দ্রীভূত সূর্য-রশ্মিতে। ইরান দেশের পাহাড়ের পথ পাড়ি দিতে গিয়ে যাঁদের দেহ হয়েছে শক্তিশালী। বরফের গুহাতে ঘুমিয়ে তাঁরা প্রমাণ করেছেন, কোনও আবহাওয়াই কখনও তাঁদের ধ্বংস করতে পারবে না। তাঁদের হাত শক্ত হয়েছে তলোয়ারের খাপ ধরে, সাহস এসেছে বাঘ আর কুমিরের সাথে লড়াই করে। মহিষের হাড় আর তুনা মাছের মেরুদণ্ড চিবিয়ে তাঁদের দাঁত মজবুত

হয়েছে। ভালোবাসা তাঁদের হৃৎপিণ্ড বড় করেছে। আর আধ্যাত্মিকতাও তাঁরা পালন করতেন। তাঁদের মন নিষ্কন্টক ছিল বলেই আমরা জানি।

এত কিছুর পরও শেখদের দুই এক জন রোগা-পাতলা হবে না, এ কথা বলা যাবে না। মোগলদের বংশেও জীর্ণ, অন্ধ, খঞ্জ প্রচুর সন্তানের জন্ম হয়েছিল। এর ব্যাখ্যাও বিজ্ঞানে রয়েছে।

তবে আমার এ কাহিনি বিজ্ঞানের নয়, জীবনের।

বিশ সালের বসন্তের এক সন্ধ্যায় আমার জন্ম হয়েছিল। সে নিয়ে নানান কথা প্রচলিত আছে। পর-পর দুটি মেয়ের পর সায়েরা খাতুনের তৃতীয় সন্তান যখন ছেলে হলো, তখন নাকি তাঁর পিতা শেখ আবদুল মজিদ, মানে আমার নানা, উচ্ছ্বাসের পারদ নামাতে সারা রাত বাড়ির উঠানে লাফালাফি করেছিলেন। আর সায়েরা খাতুন নাকি আমার কান্না শোনার পর এক লাফে প্রসূতির শয্যা ছেড়ে জায়নামাজে সারা রাত পার করে দিয়েছিলেন। এ সব কথা বিশ্বাস করা অমূলক। কারণ নাড়ির কী হলো, এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটা আজও কেউ আমাকে দিতে পারেননি। আমার পিতা কী করেছিলেন, তারও নানান বর্ণনা আছে। কিন্তু কোনওটাই তাঁর স্বভাবের সাথে মেলে না। আমার জনক হইচই করে আনন্দ প্রকাশ করার মানুষ নন। আবার সংসারে পুত্রের আগমনে তিনি নির্লিপ্ত থাকবেন, তা-ও বিশ্বাসযোগ্য নয়। এত গল্পের মধ্য থেকে যে সত্যটা উদঘাটন করা গেছে, তা হলো, সন্ধ্যাকালের ঝড়ো হাওয়া চৈত্র দিনের তাপদাহ উড়িয়ে নিয়ে যায়, আর প্রসূতি সায়েরা খাতুন সঙ্কটকালে শীতল বায়ুর পরশ পান। (তবে নবাগতকে স্বাগত জানাতে গিয়ে আমাদের এই শেখ গোষ্ঠীর, এবং সার্বিকভাবে টুঙ্গিপাড়াবাসির, অতিরঞ্জনও আমি নিজ চোখে দেখেছি। সেটা রেণুর জন্মের পর। সময় মতো সে কথা বলা যাবে।)

আজ দিনটা রেণুর জন্য। রেণু আজ কিশোরী। রেণু এক হৃষ্টপুষ্ট আবেগপুঞ্জ সৌন্দর্যের সমাবেশ, যা আমি প্রথম খেয়াল করি চৌত্রিশ সালে।

ওই বছরের ভাদ্র মাসের এক বিকালে আমি ঝিরিঝিরি বৃষ্টি আর ভ্যাপসা গরমে গিমাডাঙ্গা স্কুলের মাঠে সতীর্থদের সাথে ফুটবল খেলছি। আমরা বাইশটা ছেলে দুই ভাগ হয়ে বাঁশের লাঠি দিয়ে গোলপোস্ট বসিয়ে পায়ে পায়ে লড়াই করি। আনন্দে সময় কেটে যায়। দুই চারটা ছেলে অকারণে গড়াগড়ি করে। কেউ কেউ লাফ দেয়। কেউ ডিগবাজি খায়। দুএক জন নিজেদের মধ্যে ঠোকাঠুকি করে। আবার সবাই ফুটবলের পেছনে দৌড়ায়। খেলা জমে ওঠে। আমাদের দলের একজন উন্মত্ত হয়ে সাদা-কালো বলটাতে কিক করে। ওটা গিয়ে প্রতিপক্ষের একটা ছেলের পায়ের কাছে পড়ে। সেই

ছেলে নিজের গোল পোস্টের দিকে কিক দেয়, আর তার দলের একজনের কাছ থেকে ধাক্কা খেয়ে মুখ কালো করে বসে পড়ে। আবার উঠে গিয়ে নিজের দলকে জেতানোর জন্য দৌড়তে থাকে।

কিছুক্ষণ ধরে আমি ব্যাপারটা টের পাচ্ছিলাম। আমার পা দুটি কাঁপছিল। আমি টুঙ্গিপাড়া গ্রামের ছেলে। চার বছর ধরে আব্বার কর্মস্থল গোপালগঞ্জের মিশন স্কুলে পড়ি। টুঙ্গিপাড়ায় বেড়াতে আসলে প্রথম রাত আমার কখনও ঘুম হয় না। সারা রাত গ্রামের কথা, গ্রামের মানুষের কথা, সতীর্থদের কথা ভাবি।

ভাবলাম নির্ঘুম রাত কাটানোর ফলে হয়তো আমার এই দুর্বতলা। নিশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিল। তারপরও আমি অবশ্য কারও চেয়ে কম লড়ি না। ফুটবলের সাথে আমার পায়ের আশৈশব সখ্য। আমার আব্বা ফুটবল খেলা ভালোবাসেন। আমি ভালোবাসি। আমার ধারণা আমার সন্তানরাও তা-ই করবে।

আমার দল ভালো খেলে। আমারও উৎসাহ বাড়ে। এক সময় বলটা আমার পায়ের কাছে আসে। আমি ওটা নিয়ে এগিয়ে যাই। মাঠের চারিদিকে দর্শক। যাঁরা শুষ্ক থাকতে চান, তাঁরা আশ্রয় নিয়েছেন স্কুলের বারান্দায়। অনেকে অবশ্য ভাদ্র মাসের বৃষ্টিকে বৃষ্টিই মনে করেন না। তাঁরা লাইন ধরেছেন স্কুল ঘরের বিপরীত দিকের রাস্তায়। দর্শকদের কেউ নৌকার মাঝি, কেউ দোকানী, কেউ কৃষক, কেউবা হিন্দু জোতদারের চাকর বা মুসলমান আড়তদারের কর্মচারি। তাঁরা হাততালি দেন। আমি পায়ে পায়ে বল নিয়ে দৌড়াই। এক জন আমার কাছ থেকে বল কেড়ে নিতে এসে আমার বাহুর সাথে বাড়ি খেয়ে নিজেকে কোনও মতে সামলায়। এক জন আমার পেছনে পেছনে আসে। আমি তার ফোঁপানির শব্দ শুনি। সিদ্ধান্ত নিই কোনও কিছুকেই বলের উপর থেকে আমার মনোযোগ কেড়ে নিতে আমি অনুমতি দেব না। কয়েকজন আমার দুই পাশে লাফায়। অনেকটা অকারণে। আমার সব একাগ্রতা আমি আমার পায়ে জড়ো করি আর খেলতে খেলতে আমি প্রতিপক্ষের গোলপোস্টের কাছে চলে আসি। তারা আমাকে চারিদিক থেকে ঘিরে রাখে। শৈশব থেকে অনুশীলন করে শিখেছি কী করে খেলার উত্তেজনাপূর্ণ সময় বল পায়ের কাছে রাখতে হয়। আমি তা-ই করি। আর সুযোগ বুঝে কিক করে বলটাকে একটা ছেলের মাথার উপর দিয়ে চালান করে দিই।

গোল হয়েছিল কি না, আমার জানা হয়নি। বলে কিক দিতে গিয়ে দেহের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলাম। তারপর আমার পা আকাশে, মাথা পাতালে,

আর সব কিছু আমার চারিদিকে লাটিমের মতো ঘোরে। আমি তিন জন করিম, চার জন বাবুল, পাঁচটা গোলপোস্ট, দশটা আমগাছ, বিশটা কাঁঠালগাছ, কয়েকশত নারকেলগাছ দেখি। লম্বা স্কুলটা চারটি ঘরে পরিণত হয়ে একটা আর একটার মধ্যে ঢুকে গেছে। আমি যাদের দেখি তাদের সবারই আমার মতো অবস্থাঃ পা আকাশে, মাথা ভূমিতে। আমি ঘূর্ণিটা বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারি না। এক সময় আমি মাটিতে পড়ে যাই।

পিঠের নিচে ভেজা খসখসে ঘাস। আমি কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে রাখি। টের পাই মাথা ঘোরা কমছে। কিন্তু শুরু হয় মাথা-ব্যথা। নিমেষে তা বেড়ে যায়। কপালটা কাঁপতে থাকে, বুঝি ফেটে মগজ বের হয়ে আসবে। আর যেন এক দল জ্বিন কামান থেকে আমার দুই কানে ফুটন্ত পানির গোলা নিক্ষেপ করছে।

আমি ব্যথা সহ্য করি আর অপেক্ষা করি ওটা ভোঁতা হয়ে আসার জন্য। মানুষের সামনে বমি করব না, এই প্রতিজ্ঞাও অটুট রাখি। আমার গেঞ্জি আর হাফপ্যান্ট কাদায় ডুবে আছে। পা দু'টি ছড়ানো। ফুসফুসে অনুভব করি বায়ু-শূন্যতা, যদিও শ্বাসপ্রশ্বাসে আমার বুক তিন ইঞ্চি করে ওঠানামা করে।

আমার চার দিকে সতীর্থ আর দর্শকের ভিড়। আমার অস্বস্তি লাগে। এমন কেন হলো? শুধু এক রাতের নিদ্রাহীনতার কারণে এটা হওয়ার কথা নয়। মাসখানেক ধরে একটু দৌড়ালে বা ও-রকম কিছু করতে গেলে আমার বুক ধপধপ করত। আবার গতি থামার কিছু সময় পর বুক শান্ত হয়ে যেত। মনে হলো ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেয়া ঠিক হয়নি।

আমার পায়ের কাছে কয়েকজনের কথা কাটাকাটি চলে। কী হলো? কী হলো? মৃগী রোগ? অবশ্যই মৃগী রোগ। কবে থেকে শেখের বেটার মৃগীরোগ? আগে কয় বার মূর্ছা গেছে, কে বলতে পারে? শেখ বাড়ির বয়স্ক কেউ এখানে আছে কি?

"মৃগী ট্রিগি কিছু নয়,"এক জন বলেন, "যে জোরে মজিবরের মাথায় বল লেগেছে। আমি নিজ চোখে দেখেছি।"

"যে ছেলেটা পড়ে গেছে," অন্য এক জন বলেন। "সে মজিবরের মাথায় পিছন থেকে গদা দিয়ে মারে। মফিজ তুমিওতো দেখছ।"

মফিজ নামের লোকটা মাথা উপর-নীচ করেন।

"জিন-ভূতের আছর আছে কি না সেটা আগে জানা দরকার?"

একজন একটা চামড়ার জুতা আমার মুখের উপর ধরেন। "মজিবর, বুক ভরে গন্ধ নাও।"

"জুতা কেন? শেখের বেটার জ্ঞান আছে, দেখতেছ না?"

"এটা মৃগীরোগের আক্রমণ।"

"মৃগীর লক্ষণ কই? ও-তো কাঁপতেছেও না।"

"মুখে ফেনা কই?"

"তোমার এই পচা জুতার গন্ধে মৃগী চলে আসবে।"

একজন জুতার মালিকের হাত থেকে জুতাটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেন।

"তোমরা সবাই সরো," গিমাডাঙ্গা স্কুলের শিক্ষক তাহের স্যার বলেন। উনি দুই হাত দিয়ে লোকগুলোকে দুই দিকে ঠেলে আমার মাথার কাছের জায়গাটা ফাঁকা করেন। "মজিবরের বাতাস দরকার," তাহের স্যার বলেন।

আমার বুকে ভাদ্র মাসের গরম বাতাস চাপড় মারে। আমি খেয়াল করি বৃষ্টি থেমে গেছে। দেখি কবিগুরুর আঁকা রং। *নীল আকাশে কে ভাসাল সাদা মেঘের ভেলা রে ভাই, সাদা মেঘের ভেলা?*

মিনিট কুড়ি পর বুক ধড়ফড় কমে আসে। আমি উঠে দাঁড়াই। অনেকে আমাকে কাঁধে করে বাড়ি পৌঁছে দিতে চান। আমি বলি, আমি ঠিক আছি। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

বাড়ির পথে হাঁটা ধরি। অনেকগুলো লোক কাটা খাল পর্যন্ত আমাদের এগিয়ে দেন। অনেক কষ্টে নৌকায় উঠি। চার বছর আগে একবার স্কুল থেকে ফেরার সময় নৌকা থেকে এই খালে পড়ে গিয়েছিলাম। সে দিন এখানে এত পানি ছিল না। তারপরও বুকে বই চেপে ধরে শুধু পা ছুঁড়ে ভেসে থাকার চেষ্টা করি। মাঝি আমাকে উদ্ধার করার আগে কয়েক সের পানি খাওয়া হয়ে যায়। তারপর আম্মা আর আমাকে গিমাডাঙ্গা স্কুলে যেতে দিলেন না। আমাকে আব্বার কর্মস্থল গোপালগঞ্জে পাঠিয়ে দিলেন।

নৌকায় আমার সাথে আরও এক ডজন ছেলে ছিল। ওরা আমাদের বিভিন্ন দরিদ্র আর জান্নাতবাসি আত্মীয়স্বজনের সন্তান, থাকে আমাদের বাড়িতে। ওদের কয়েক জন ফুটবলটার জন্য আক্ষেপ করে। আমার ফুটবল। আব্বা কিনে দিয়েছিলেন।

আমি বলি, "চিন্তা কোরো না তোমরা। আমি আব্বাকে বলব তোমাদের জন্য আর একটা বল আনতে।"

"মিয়া ভাই, কথা বোলো না," আমার এক তৃতীয় স্তরের চাচাত ভাই বলে। "তোমার কষ্ট হচ্ছে।"

আসলেই আমার কষ্ট হচ্ছিল।

নৌকা থেকে নেমে হাঁটতে গিয়ে মনে হলো আর পারব না। বাড়ির

ছেলেগুলো আমাকে ঘিরে রাখে। এক মাইলেরও কম পথ। মনে হলো একশ মাইল হাঁটছি। তবু বাড়ির দেখা মেলে না।

হেঁটে ভালো করিনি। বাড়ি পৌঁছে কিছুতেই শরীরের কাঁপন ঠেকিয়ে রাখতে পারছিলাম না। তাই আমি সোজা খাটে চলে যাই।

বিছানার ছোঁয়ায় মনে হয়, আহা কী শান্তি। এমন সুখতো আগে কখনও অনুভব করিনি। আমার সারা শরীর শীতল হয়ে আসে। চাঞ্চল্যের বুঝি চির-বিদায় হয়। মস্তিষ্কের দ্বার খুলে যায়। কোরানের আয়াত মনে আসে। *ওয়া বাশ্‌শিরিল্লাজিনা আমানু ওয়া আমিলুসসোয়ালিহাতি আন্না লাহুম জান্নাতিন তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার...আর সুসংবাদ দিন তাঁদের, যাঁরা ঈমান এনেছেন। তাঁদের জন্য রয়েছে জান্নাত। যার তলদেশে ঝর্নাধারা প্রবাহমান।*

আমার শিরায় শিরায় সে সুধা বয়ে যায়। আর ঘুম আসে। যেন আমি বেহেশতে চলে যাচ্ছি। আর ফিরব না। কোনও দুঃখবোধ অনুভূতিতে নাই। সব চিন্তা চলে গেছে। চিন্তাহীনতায় এত সুখ। সুখে বুঁদ হয়ে খুব দ্রুত চলে যাচ্ছি। চলে যাওয়ার আগে আমি চোখ বন্ধ করি।

আমি সারা রাত অচেতন থাকি। চেতনা ফিরে আসার সময় ক্লান্তি আমাকে চেপে ধরে। মনে হলো মৃত্যু থেকে ফিরে এলাম, যেখানে কোনও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ছিল না। আর এখন জেগে ওঠার সময় মনে হলো জন্মগ্রহণ করছি। কবর থেকে। আর মানসিক ব্যাধিগুলো ফিরে আসছে একে একে। চোখের এক একটা পাতার ওজন দশ সের। ওগুলো খুলতে গিয়ে কপালের উপর চাপ অনুভব করি। এর মধ্যে বুঝি পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেছে। আর আমি তারুণ্য, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব পেরিয়ে পরাধীন ভারতবর্ষের এক প্রবীণ নাগরিক। আর কখনও বিছানা থেকে উঠতে পারব না। চোখ দুটি আবার আপনা-আপনি বুঁজে আসে।

টের পাই ঘর আর উঠানে অনেক মানুষ। এক সময় আমি মাথাটা এ-পাশ ও-পাশ করতে সমর্থ হই। মনে আছে আমি মাঠের ভেজা কাপড় নিয়ে বিছানায় গিয়েছিলাম। এখন আমার গায়ে পরিষ্কার পাজামা আর শার্ট। আম্মা মাটিতে বসে আছেন, আমার মাথার পাশে। তারপর আমার চোখ পড়ে রেণুর উপর।

সে দিন প্রথম রেণুকে আমি ভালোভাবে দেখি। কিছুক্ষণ ওর কটা চোখে আমার চোখ লেগে থাকে। সাদা তুলতুলে গোলগাল চেহারা। গোলাপী জামা পরে রেণু উৎসুক নয়নে আমাকে দেখে। মসৃণ ছোট একটা নাক। সাদা গাল দু'টি বুঝি কোনও পাহাড়ি ঝর্ণাধারার মসৃণ রূপ। জানালা দিয়ে সূর্যালোক এসে ওর ঘন চুলে জড়ো হয়। রেণুর পেছনে জানালার বাইরে একটা পেপে গাছ। কাছে কোথাও একটা দোয়েল পাখি ডাকে। আমার আনন্দ তখন জীবন ফিরে পাওয়ার আনন্দ। রেণুর বয়স তখন চার। আজ বুঝি সেটা কত সৌভাগ্যের ছিল। মুরুব্বিদের দেয়া উপহার। আসলে রেণু তখন এক বছর

ধরে আমার স্ত্রী।

মেজ চাচির কথায় বুঝি, আব্বা রাতেই নৌকা নিয়ে গোপালগঞ্জ গিয়েছিলেন ডাক্তার আনতে। আর এক ফুফার কথায় বুঝলাম, আব্বা এখন ডাক্তারকে সাথে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। চাচি-ফুফু-খালা আর তাঁদের স্বামী-সন্তানদের গুঞ্জন বাতাস ভারী করে। আমি ছাড়া আর সবাই আমার জন্য কষ্ট পান।

আম্মা দেয়ালের দিকে সরে যান। এক জন একটা মোড়া এনে আমার বুকের কাছে রাখেন। ধুতি পরা পৌঢ় ডাক্তার আমার পাশে বসেন। সাথে সাথে আমার কব্জি ডাক্তার বাবুর হাতের মুঠোয়। ডাক্তার বাবু চোখ বন্ধ করেন। আমি তাঁকে দেখি। আমি দেখি সবাই নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছেন। ডাক্তার বাবু আমার কব্জি ছেড়ে দেন। তিনি আমার চোখের পাতা উল্টে ভেতরটা ভাল করে দেখেন। তারপর আমার আর ডাক্তার বাবুর চোখাচোখি হয়। ডাক্তার বাবুর মুখের তৈলাক্ত কালো রঙে নীল আভা যুক্ত হয়। বুঝলাম আমাকে দেখে তিনি চিন্তিত হয়েছেন।

ডাক্তার বাবু তাঁর কালো ব্যাগটা টেনে কোলের উপর নেন। আমি বেগের চেইন খোলার শব্দ শুনি। তিনি ব্যাগ থেকে স্যালাইন, পাইপ, ক্লিপ, ফিতা, আর চারটা ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ বের করে খাটের উপর রাখেন। তারপর আমার ডান হাতের পিঠের রগে সুঁই ঢোকান। মোটা মানুষের অবিচল দক্ষ হাত। ডাক্তার বাবু দাঁড়িয়ে স্যালাইনটা খাটের উপর মশারি টাঙানোর বিমের সাথে ঝুলিয়ে দেন। পাইপটা সেলাইনের থলেতে ফিট করেন, পাইপের উপর চাকাটা ঘুরিয়ে স্যালাইনের ফোঁটা নিয়ন্ত্রণ করেন। টপটপ করে ফোঁটাগুলো পড়ে পাইপের মাথায় ঢেঁড়স সাইজের খাপটাতে জমা হয়।

কাজ শেষ করার পর ডাক্তার বাবু একটা নিশ্বাস ফেলেন।

সূঁচ থেকে রগ দিয়ে স্যালাইন-পানি আমার ভেতরে প্রবেশ করার অনুভূতি আমি ধরতে পারি। আমি পানির ধারাটা খেয়াল করতে থাকি। বুঝতে পারি তা আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। আমার একটু একটু ভাল লাগছে। আমি আমার অনুভব সেলাইনের ধারায় কেন্দ্রীভূত করি। বুঝতে পারি আমার শরীরে ক্ষীণ ধারার প্রাণের সঞ্চার ঘটে চলেছে। আমার আর ডাক্তার বাবুর আর এক বার চোখাচুখি হয়। তিনি আর একটা নিশ্বাস ফেলেন। আমি দেখি তাঁর মুখে রক্ত ফিরে এসেছে। আর বুঝি ওটা ছিল স্বস্তির নিশ্বাস।

আমার হাতে সেলাইনের সুঁই লাগানো অবস্থায় ডাক্তার বাবু দুই ঘণ্টা

ধরে হৃদ্বীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে আমার বুক ও পিঠ পরীক্ষা করেন। ওই দুই ঘন্টা আমার আব্বার চোখ আমার উপর থেকে সরে না। আমার চোখ বার বার আম্মাকে খোঁজে, কিন্তু পায় না। ডাক্তার বাবু কান থেকে যন্ত্রটা নামিয়ে হাতে ধরেন, আর বলেন, "আমি তো তেমন কিছু পেলাম না।"

ডাক্তার বাবুর কণ্ঠে উচ্ছ্বাসের আভাস নাই। আমি চোখ ঘুরিয়ে দেখি অন্যদের চোখেও উদ্বেগ। নারীরা সরে পেছনে চলে গেছে। আমি শুধু পুরুষদের দেখি। আব্বার চোখ আমাকে দেখে। তীক্ষ্ণ গভীর চোখ। আব্বার প্রশস্ত কপাল টানটান হয়ে আছে। তিনি আমার থেকে চোখ সরিয়ে ডাক্তার বাবুর মুখের দিকে তাকান।

"ও কি ভালো আছে, ডাক্তার বাবু?" আব্বা কাতর হয়ে জিজ্ঞাসা করেন।

ডাক্তার বাবু উত্তর করেন না।

"চুপ করে আছেন কেন, ডাক্তার বাবু?" আব্বা বলেন। "কেন কথা বলছেন না?"

"আর এক বার দেখি," ডাক্তার বাবু বলেন।

ডাক্তার বাবু হৃদ্বীক্ষণ যন্ত্রটা আর এক বার কানে লাগান। যন্ত্রের ডায়াফ্রামটা আবার আমার পাজরের উপর চেপে ধরেন। পনেরো মিনিটের উপর তিনি আমার বুক আর পিঠ অনুভব করেন। পেটের উপর আঙ্গুল দিয়ে চাপ দেন। পিঠেও। তারপর তিনি আবার যন্ত্রটা বিছানার উপর রাখেন।

"আমার ছেলে যে জ্ঞান হারিয়েছে, ডাক্তার বাবু," আমার আব্বা বলেন।

আমি কারও ফোঁপানির আওয়াজ শুনি। তবে তা আমার আম্মার শব্দ নয়।

"সেটাই ভাবছি," ডাক্তার বাবু বলেন।

আমি আমার আব্বাকে দেখি। তাঁর দুই কাঁধ শক্ত হয়ে ছিল। এখন তিনি ওগুলো ছেড়ে দিলেন। যেন আমার আব্বা নিজের মধ্যে ফিরে এসেছেন।

"ডাক্তার বাবু, খুলে বলেন। যা পেয়েছেন, তা-ই বলেন।"

"উপসর্গ দেখে মনে হচ্ছে হার্টে এক বা একাধিক ছিদ্র আছে।"

আমার চোখ জনতার দিকে ঘোরে এবং তারপর আমার আব্বার চোখের সাথে মিলিত হয়। উপস্থিত মান্যগণ্যগণ একে অপরের দিকে তাকান। সবচেয়ে বেশি তাকান আমার দিকে। তাঁদের দৃষ্টি দেখে মনে হয় আমার গালের এক দিক বুঝি পুড়ে গেছে। যেন তাঁরা আগে আমাকে কখনও দেখেননি। তারপর এক সাথে অনেকগুলি নিশ্বাসের শব্দ শুনি। এক জন কথা বলে ওঠেন।

কী? ছিদ্রি?

এটা আবার কী?

কখনওতো এ রোগের নাম শুনিনি।

কী অসুখ এটা?

আমি শুনেছি।

কী?

কী, বোঝো না?

না, বুঝি না।

আরে গাধা। ফুটা, ফুটা। হার্টে ফুটা।

কীসের ফুটা? কেমন করে এটা হয়?

মজিবরের হার্ট ফুটা হলো কী করে?

হার্ট ফুটা হলে কী হয়?

"রোগী যে কোনও সময় মাথা ঘুরে পড়ে মরে যায়, " ডাক্তার বাবু বলেন।

তাঁর কথা শুনে, শরৎচন্দ্রের ভাষায় বলিতে হয়, *তখন বাটীময় ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে।*

সবাই আল্লাহকে ডাকেন। ঈশ্বরের নামও শুনা যায়। চাচি-ফুফুদের আর্তচিৎকার আমার কানে বাজে। আমার মন খারাপ হয়। সবাই আমাকে কত ভালোবাসেন।

আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম আমি বাঁচব না। এ রকম সময়ে ভয়ে হয়তো আমার চেতনা আর একবার চলে যাওয়া উচিত ছিল। কিংবা আমার উচিত ছিল নীরবে কাঁদতে কাঁদতে অল্প বয়সে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার দুঃখকে ভারী করে তোলা। আমি কোনওটাই করিনি।

আমার ভাবনা বিদ্ধ ছিল অন্য জায়গায়। মনের মধ্যে বিষয়টা বার বার উঁকি দিচ্ছিল। এক সময় আমি তার সূত্র খুঁজে পাই। আমি যে তখন কত দুর্বল আমি শরীরটা একটু ঝাঁকুনি দিতে গিয়ে বুঝি। ঝাঁকুনিটা আমার দরকার ছিল, আমার বোধশক্তি ঠিক আছে কি না তা পরীক্ষা করার জন্য। আমি নিজেকে কয়েক বার জিজ্ঞাসা করি, ব্যাপারটা ঠিক কি না। এত অল্প বয়সে এত কঠিন ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব কি না? আমি নিজেকে প্রশ্ন করে চলি। আর বার বার একই উত্তর পাই। তারপরও এত অল্প বয়সে আমার এত বড় মুক্তি ঘটে গেল তা আমি বিনা দ্বিধায় মেনে নিতে পারছিলাম না। আমি সময় নিই।

এর পর আট বছর চলে গেছে। এই আট বছরে সেই মুক্তির ব্যাপারে আমার কোনও দিন এক বিন্দু সন্দেহ মনে আসেনি। আর এখন আমি যত চাই তত বার আনন্দের সাথে নিজের কাছে ঘোষণা দিতে পারি: সেই আট বছর আগে আমি মৃত্যুভয় থেকে মুক্তি পেয়েছিলাম। এবং তা সম্পূর্ণরূপে এবং চিরকালের জন্য।

আর এভাবে আমি সে-দিন জীবনের এক অলঙ্ঘ্য সমস্যা অতিক্রম করেছিলাম। চেতনাহীন হওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায়ে তা সম্ভব ছিল কি না, জানি না। এই নির্ভীকতার যে অপরিসীম প্রভাব আমার জীবনে, তা-ও আমি ধীরে ধীরে বুঝেছি। এক সময়ে এসে জানলাম, চূড়ান্ত বিচারে, মৃত্যু-ভয়ই পৃথিবীতে মানবসৃষ্ট সকল দুঃখের আদি কারণ। মৃত্যু-ভয়ে শঙ্কিত নয়,

এ রকম মানুষ আমার এই বাইশ বছরের জীবনে খুব কম দেখেছি। সেই বিমূর্ত অভয় আমার জীবনের এক অনুপম ক্ষমতা হিসাবে আবির্ভূত হয়, সকল অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে, যাদের ধ্বংস করাকে আমি আমার জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছি। আজ এ কথা বলতে আমার কোনও দ্বিধা নাই, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারার মানে হলো জীবনের পূর্ণতা লাভ করা। আট বছর আগে, যখন ডাক্তার বাবু আমার মৃত্যু-বার্তা দিয়ে দিলেন, তখন এই অভয় আমাকে সুখ না দিলেও অনেক শান্তি দিয়েছিল।

আট বছর আগের সেই সকালে আমি নিজেকে নির্ভয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কবে কোথায় কখন আমার মৃত্যু হবে? এক দিন পর? এক সপ্তাহ পর? এক মাস পর? আমার হার্টে ছিদ্র আছে, এ কথা বের হয়েছে গোপালগঞ্জের সবচেয়ে বড় ডাক্তার নলিনী বাবুর মুখ থেকে।

আমি নিজেই ডাক্তার বাবুকে সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করেছিলাম। আমার মন খারাপ হয়। জন্মগ্রহণ করেছি হৃৎপিণ্ডে মৃত্যুগহ্বর ধারণ করে। তার জন্যেই কি জীবন নিয়ে আমার এত আগ্রহ ছিল এত দিন? কাজের প্রতি আগ্রহ, মানুষের প্রতি আগ্রহ, হিংসা-বিদ্বেষ নাশ করার প্রতি আগ্রহ। জমিদার-জোতদারের নিপীড়ন বন্ধ করার আগ্রহ। ইংরেজ বিতাড়নের আগ্রহ। বন্ধু-সতীর্থদের নিয়ে বৃষ্টির মধ্যে খোলা মাঠে কাদাপানিতে লাফঝাঁপ করার আগ্রহ। বাইগার আর মধুমতির পাড়ের লতাগুল্ম আর বৃক্ষরাজির প্রতি আগ্রহ। জলে বাস করা মাছ, শুশুক আর পাড়ে বাস করা কেঁচো, সাপ, গুইসাপ, বেজির প্রতি আগ্রহ। ধানক্ষেত, পাটক্ষেত, কলাগাছের প্রতি আগ্রহ। ফুটবল, হকি আর ভলিবলের প্রতি আগ্রহ। আব্বার কেনা আনন্দবাজার, বসুমতী, আজাদ, মাসিক মোহাম্মদী, সওগাত পত্রিকার পরের চালান আসার আগে পূর্বের চালানের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে ফেলার আগ্রহ। হয়তো ত্রুটিযুক্ত হৃদ্‌যন্ত্র পৃথিবীতে আমার সময় সংক্ষিপ্ত করার পাশাপাশি আমার অবচেতনে আমার কর্মের চাকাকেও দ্রুত ঘুরিয়ে চলছিল।

ডাক্তার বাবু আমাকে পাহারা দেন। ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে আমি একটা স্যালাইনের পুষ্টি গ্রহণ করি। ডাক্তার বাবু আর একটা স্যালাইন ফিট করেন। একই সুঁইয়ের মাথায়। আমি তখন ভালো বোধ করছিলাম। ডাক্তার বাবু ঘোষণা দিলেন, আমি আপাতত বিপদ-মুক্ত, তবে মৃত্যু-রোগের থাবা যে কোনও সময় হানা দিতে পারে।

তখন আমি জ্ঞান হারানোর পূর্বে অনুভব করা চিন্তাশূন্য শান্তিটা স্মরণ করি। ওই চিন্তাশূন্য দেহানুভূতির কী সুখ, তা বলে বুঝানো যাবে না। যে এ-

সুখ না পেয়েছে, বা তার নির্যাস ধরতে ব্যর্থ হয়েছে, সে তা বুঝতেও পারবে না। তখনও চেতনহীনতার রেশ আমার অস্তিত্বে রয়ে গিয়েছিল। আর সে-জন্যই আমি বার বার ওই মন-শূন্য দেহের অনুভূতিটা পেতে চাচ্ছিলাম। আমার কামনা এত গভীর ছিল যে, তা পূর্ণ করার জন্য আমি এমনকি আর এক বার মূর্ছা যেতেও রাজি ছিলাম।

কিন্তু আমি শুধু আমার নই। তখন রেণু, আমার পিতা-মাতা, বিস্তৃত শেখ গোষ্ঠীর সদস্যবৃন্দ, টুঙ্গিপাড়ার জনগণ, সবাই আমাদের বাড়িতে। আমি সবার কথাই ভাবি। সবচেয়ে বেশি ভাবি রেণুর কথা। আমি চলে গেলে রেণুর ক্ষতিই সবচেয়ে বেশি হবে। অথচ রেণু তা তখন জানবেও না। ও জানবে বড় হয়ে। তখন আমাকে ওর মনে থাকবে না। মনে থাকবে আমার মৃত্যু দ্বারা তৈরী হয়ে থাকা ওর জীবনের সঙ্কট। সে কথা ভেবে আমি আমার কপালে উত্তাপ অনুভব করি। মৃত্যুকে মেনে নিতে আমার ভয় হয় না, কিন্তু সঙ্কোচ হয়। আমি রেণুর দিকে চাই। ওর অবুঝ চোখ সবার দিকে চায়। আমি দেখি কোলাহলের মাঝে ওর বিমূঢ় ভাব।

বুকে ভার অনুভব করি। দুই চোখ সহসা গরম অশ্রুতে ভরে যায়। মুক্ত বাহুখানা চালিয়ে আমি তা মুছে ফেলি। আমি অবশ্যম্ভাবীকে মেনে নিই। কিন্তু অন্যরা তা মানেন না। তাঁদের ইচ্ছা-শক্তি বুঝি আমার মৃত্যু ঠেকিয়ে রাখবে। এর পরে আমি অনেক বার মানুষের জাগরণ লক্ষ করেছি। কখনও এ এক ভয়ানক দানব। কখনও বা অসূরের বিরুদ্ধে তা এক অদম্য শক্তি। মানুষের সামগ্রিক ইচ্ছাকে তাই ভালো কাজে নিয়োজিত করার জন্য মানুষকে সচেতন হতে হয়। অসচেতন মানুষ পৃথিবীতে শুধু ধ্বংস আর ধ্বংস চালায়। এই যেমন এখন তারা ইউরোপকে নরকে পরিণত করেছে, যা অশান্ত মানুষের অদম্য ইচ্ছার অসচেতন প্রয়োগের আশু ফল। যার কারণে পৃথিবীর বিস্তৃত অংশের মানুষ ভোগ করছে স্বীয় কর্মের হলাহল। ভারতবর্ষে বিদ্যমান অসচেতন সাম্প্রদায়িক ঘৃণা আমাদের জীবনেও একই দুর্ভোগ নিয়ে আসতে পারে। সে ব্যাপারে আমাদের নেতারা সচেতন আছেন, তাতো মনে হচ্ছে না।

তবে আমার পক্ষে যা সম্ভব আমি তা করব। বাসরের পর আমি নেমে যাব, হাজার যুবককে টেনে নিব, তাদের সচেতন করব। কতটুকু করতে পারব, জানি না। শুধু বলতে পারি আমি আমার একটা সেকেন্ডও নষ্ট করব না। এখন ফিরে যাই আট বছর আগের সেই প্রভাতে।

তখন ডাক্তার বাবুর মুখে আর উদ্বেগের টানটান ভাবটা নেই। হৃদ্‌যন্ত্রের

ছিদ্র থেকে আশু মৃত্যু না হলেও জলশূন্যতায় আমার মৃত্যু নিশ্চিত ছিল। তিনি আমার দেহকে জল দিয়ে বাঁচিয়েছেন।

এক সময় দ্বিতীয় স্যালাইনটা খালি হয়। ডাক্তার বাবু সুঁইয়ের মাথা থেকে স্যালাইনের পাইপটা খুলে নেন। তারপর তিনি যত্ন করে আমার হাত থেকে সুঁইটা খোলেন। সূঁচের বিপরীত গতিতে রগে একটা খোঁচা লাগে। ডাক্তারবাবু এক টুকরা ফিতার সাহায্যে ক্ষত-স্থানটা তুলার সাথে বেঁধে দেন। তিনি নাস্তা খাবেন। সব ব্যবস্থা হয়ে আছে। আমার এক চাচা তাঁকে নিতে আসেন। ডাক্তার বাবু তাঁর ব্যাগটা গুছিয়ে ওটা হাতে করে উঠে আমার ওই চাচার সাথে বের হয়ে যান।

আমার আব্বা অন্যদের মতো গড্ডালিকায় চড়ার মানুষ নন। তিনি ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে আমার মুখের দিকে চান। তাঁর চোখে-মুখে ব্যথার ধূসর আবরণ।

"খোকা, তুমি ভয় পেয়ো না।"

আমি বলতে পারি না, আব্বা আমি ভয় পাচ্ছি না।

"খোকা কি ভয় পাওয়ার ছেলে?"

কথাটা আমার আম্মার মুখ থেকে শরের ফলার মতো বের হয়ে আসে।

জননী হাঁটুতে ভর দিয়ে আমার মাথাটাকে তার দুই হাতের মধ্যে টেনে নেন। তাঁর মাথায় ঘোমটা। কিছুক্ষণ আমরা এক জন আর এক জনের দিকে চেয়ে থাকি। যেন আমরা দুজনের কেউ কাউকে চিনি না। তারপর ঠিক উল্টোটা হয়। আমরা যেন এক জনের চোখ দিয়ে অন্যকে দেখছি। যেন আমার মায়ের ধমনীতে আমার রক্ত আর আমার ধমনীতে আমার মায়ের রক্ত। আমার ত্রুটিযুক্ত হৃদ্‌যন্ত্র ধারণ করে আমার মা আমার উপর ঝুঁকে আছেন আর আমি আমার মায়ের ত্রুটিহীন হৃদ্‌যন্ত্র ধারণ করে আমার মায়ের চোখের আলোয় তাঁর মুখের পৌরাণিক সৌন্দর্যের ভাষা পড়ছি। সহজ আর সুস্পষ্ট সে ভাষা।

"খোকা, এই কষ্টও আমাকে সহ্য করতে হবে? আমি মাটির উপরে থাকতে তুই কবরে চলে যাবি?"

আমার বুক ধক্ করে ওঠে। এটা অসুখের ব্যথা নয়। মাতৃস্নেহের প্রতি ভালোবাসার ব্যথা। আমার আম্মা শক্ত-সমর্থ মহিলা। জন্মসূত্রে অনেক জমি পেয়েছেন। আব্বা থাকেন বাইরে। তাই আমার আম্মা টুঙ্গিপাড়ার অন্যতম সেরা কৃষকও বটে। তাঁর এ ভাবে পতন হওয়ার কথা নয়। তবুও হলো। নিমেষে তাঁর মুখখানা আমার মুখের উপর বসে গেল।

জননীর ঠাণ্ডা গাল আমার ডান গালের সাথে মিশে যায়। আমার জীবনের

সে অনুভূতি আজ পর্যন্ত অব্যক্ত রয়ে গেছে। নবজাতিকা রেণুকে কাঁদতে দেখেছিলাম। মাতৃগর্ভের নিরাপদ স্বর্গ ছেড়ে বিপদ-সঙ্কুল পৃথিবীতে এসে সব শিশুই কাঁদে। নবজাতিকা রেণু যেই তার মাতৃ-ত্বকের স্পর্শ পেল, অমনি তার কান্না থেমে গেল। এমনকি একটুখানি হাসিও দিল। সেই মাহাত্ম্য তখন বুঝিনি। বুঝলাম চার বছর পরে, যে দিন ডাক্তার বাবু বললেন আমার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নেই। বুঝলাম কেন শিশুর জন্মকান্না মাতৃ-ত্বকের স্পর্শ ছাড়া থামে না। জন্মগ্রহণ করার পর আমি নিশ্চিতভাবে আমার মায়ের স্পর্শ পেয়েছিলাম। কিন্তু তাতো আর আমার মনে নেই। মনে থাকল এ দিনটির কথা, যার পূর্বের রাতে আমি অচেতন ছিলাম।

শুরু হয় জননীর অশ্রু বর্ষণ। আমার দুই গাল বেয়ে। মনে হলো আমার আম্মার পুরো দেহটা কান্না হয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে। এক সাথে এত অশ্রু। এমনকি আমার নিজেরও। যা ছিল আমার ভাবনার অতীত।

কিন্তু সত্য কথা হলো আমি তখনও আমার জননীকে সম্পূর্ণরূপে চিনতে পারিনি। এক সময় সে শক্তিময়ী নারী মাথা তোলেন। খাড়া নাকের নিচ থেকে চিবুক পর্যন্ত কী অপূর্ব গঠন। সুকুমার কর্ণলতিকায় ক্ষুদ্রকায় স্বর্ণালঙ্কার। বেদনার টানে ঠোঁটজোড়া কেঁপে চলেছে। তবুও তিনি আমার চোখে চোখ রাখেন। অশ্রুসজল দ্যুতিময় চোখ। যেন আমরা দুজন কোনও এক বিমূর্ত বাণিজ্যের অংশীদার। যেন ছেলের কাছে মনের কষ্ট প্রকাশ করে মায়ের দেউলিয়াত্ব ঘোষণার মধ্যে বিব্রত হওয়ার কিছু নেই।

তখন আমার চেতাহীনতার শেষ সুতাগুলো কেটে যাচ্ছিল। মায়ের ছোঁয়ায় আমার স্নায়ুতন্ত্র জেগে ওঠে। আমি আমার পিঠের পেশি থেকে কশেরুকা পর্যন্ত অনুভব করতে পারি। আমি ঠিক করি আমার হৃদ্‌যন্ত্রের আদ্যোপান্ত আমি মনের চোখে দেখে রাখব। কোথায় কোন ছিদ্র আছে তা কল্পনায় দেখে নেব। ইচ্ছাশক্তি দিয়ে আমি তাদের নিষ্ক্রিয় করে রাখব। কখনও তাদের আমি সক্রিয় হতে দেব না। ক্ষণিকের জন্য আমার চোখ রেণুর মুখ ঘুরে আসে। কী করে ওই শিশু এত সময় এক জায়গায় অবিচল বসে থাকতে পারে তা আমি আজও বুঝিনি। রেণুর উপর থেকে চোখ সরিয়ে আমি আমার জন্মদাত্রীর মুখের দিকে চাই, আর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি। মনে মনে। "আল্লাহ, এই মহিলার মৃত্যু পর্যন্ত তুমি আমাকে জীবিত রেখো।"

প্রার্থনায় আমার হৃদয় নিস্তরঙ্গ হয়। ধীরে ধীরে প্রশান্তি আমাকে ঢেকে দেয়। যেন আমার হৃৎপিণ্ডে কোনও অসুখ নেই। যে ছিদ্রগুলো ছিল তা মিলিয়ে গিয়ে আমার ভেতর একট মসৃণ কোমল হৃদয় এ মাত্র গঠিত হলো। মনে

বিশ্বাস স্থাপিত হলো: আল্লাহ আমার মোনাজাত কবুল করেছেন। আমার আম্মাকে আমার মৃত্যু দেখতে হবে না। আমার বুঝি আর এক বার জন্ম হলো।

পুরুষরা শোরগোল করে। অনেকে আড়ালে নিজের বুকে হাত বুলিয়ে নেন, স্বীয় হৃৎপিণ্ডের ছিদ্রের সন্ধানে। কেউ কেউ আতঙ্কগ্রস্ত হন। অনেকেই ধরে নেন তাঁদের হৃৎপিণ্ডে ছিদ্র আছে। ডাক্তার বাবু জলখাবার শেষে আমাকে আর এক বার দেখতে আসেন। কেউ এক জন তাঁর পথ আগলে রাখেন।

"কী এর চিকিৎসা? বলেন ডাক্তার বাবু। যদি আমি বিছানা থেকে আর না উঠি, তা হলে আমি কি বেঁচে যাব? শুয়ে থাকলেতো মাথা ঘুরে পড়ার কোনও সুযোগ নাই।"

"শুয়ে থাকো কি দাঁড়িয়ে থাকো, কোনও কিছুতেই কাজ হবে না," ডাক্তার বাবু বলেন।

"গত বছর কালাম যে মারা গেল। আমারতো এখন অন্য কথা মনে হচ্ছে। ওই দিন কোনো ঠাডাই পড়ে নাই।"

"আমিও তা-ই মনে করি। আষাঢ় মাসের ঠাডায় মানুষ মরে না।"

"আর তোমরা যে বল্লা জগন্নাথকে সাপে কাটল। কেউ কি একটা দাঁতের দাগও দেখাইতে পারছিলা?"

"মকবুলের ছেলেটা যে গোসল করতে গিয়ে আর পুকুর থেকে উঠল না, সে কথা মনে আছে?"

"হারাধনের বউ কি সত্যই গলায় দড়ি দিয়েছিল?"

আরও অনেকে বিভিন্ন বয়সের অনেক মানব-মানবীর মৃত্যুর কথা স্মরণ করেন, যা হার্টে ছিদ্র থাকার কারণে ঘটেছে বলে তাঁরা মত দিতে থাকেন। ওই সব মরহুমের কাউকে নলিনী বাবুর মতো অভিজ্ঞ ডাক্তার দেখেননি।

"কী করতে হবে, ডাক্তার বাবু?" আমার আব্বা বলেন। "কোথায় নিলে আমার ছেলে সুস্থ্য হবে।"

ডাক্তার নিবিষ্ট চিত্তে আমাকে আর এক বার নিরীক্ষণ করেন।

"ডাক্তার বাবু, আর চুপ থাকবেন না। বলেন কোথায় আছে আমার ছেলের চিকিৎসা।"

"কোলকাতা নিয়ে দেখতে পারেন।"

"অবশ্যই নিব। কোলকাতায় চিকিৎসা না হলে বিলাতে নিব।"

আব্বার কথা শুনে মনে ব্যথা পাই। কতটা অসহায় বোধ করলে আমার চির-গম্ভীর পিতা, যিনি বলেন কম শুনেন বেশি, এমন অসহায়ভাবে নিজেকে

মেলে ধরেন।

"একশ বিঘা বিক্রি করে দিব," আব্বা বলতে থাকেন। "তবুও আমার ছেলেকে বাঁচাব। নইলে সায়েরা খাতুন বাঁচবে না।"

"আপনি বাঁচবেন?" সায়েরা খাতুন, মানে আমার আম্মা, উল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন আমার আব্বার প্রতি।

আমার আর রেণুর মতো বন্ধনে শেখ লুৎফর রহমান আর সায়েরা খাতুনও আবদ্ধ। তাঁরাও চাচাত ভাই-বোন। বিয়েটা শুধু তাঁদের আত্মার সম্পর্ককে একটা নিয়মনিষ্ঠার কাঠামোতে ফেলে দিয়েছে।

তখন জীবনের জন্য বাঁধভাঙ্গা ভালোবাসা আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এক অসাধারণ পারিবারিক বন্ধনের মধ্যে কেটে যাওয়া আমার ক্ষুদ্র জীবনের অনেক বিগত মুহূর্ত চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সে বাঁধন অক্ষুণ্ন রাখার বড় সাধ হয়। আমি রেণুর চোখে চোখ রাখি। রেণু চোখ সরিয়ে নেয় না।

কয়েক দিন রেণুকে আমার বিছানার উপর বসিয়ে রাখা হয়। রেণু কী বুঝল, তা ও-ই জানে। আমি বুঝলাম, রেণু আমাকে পাহারা দেয়ার ক্ষমতা রাখে। আজরাইল যদি এসেও থাকে, সে রেণু আর আম্মা, এই দুই নারীকে সালাম দিয়ে চলে গেছে। ওই কয়েক দিন আমার আব্বাকে যে কত বার ঘরে ঢুকতে আর ঘর থেকে বার হতে দেখলাম, তার হিসাব রাখিনি। উনি হন্যে হয়ে আমাকে কোলকাতা নেয়ার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। তাই আব্বাকে খুব একটা কাছে পাই না। আম্মাকে পাই। সবাই সরে গেলে আম্মার চোখের পানি শুরু হয়। আবার লোকজন আসা শুরু করলে আম্মা গোপনে চোখ মুছে ফেলেন। লোকজন ঘর থেকে বের হয়ে গেলে আবার তাঁর অশ্রু ঝরে। "আমি মরে যাব, তবু কখনও কাউকে আমার কান্না দেখতে দিব না," আম্মা বলেন।

মাসখানেক বাড়িতে বিশ্রাম নিলাম। জাউ ভাত; বেতাগা, কাঁচা কলা আর শিং মাছের ঝোল; লাল আটার রুটি; চিংড়ি আর মিষ্টি কুমড়ার তরকারি; পাকা পেঁপে আর নলিনী বাবুর দেয়া ভিটামিন বড়ি খেলাম। উঠানের বাইরে যাওয়াও নিষেধ ছিল। কিন্তু মৃত্যু এল না।

তারপর আশ্বিনের এক রাত। এ সময় আমাদের টুঙ্গিপাড়া সাধারণত উষ্ণ থাকে। কিন্তু আগের দিন ঝড় হওয়ার পর উত্তরের বাতাস বইতে শুরু করে। বড় আরামের শীতল রাত। আম্মা আমাকে ছাড়েন না। আম্মার মুখে কোনও কথা নেই। আমি বুঝতে পারি জননীর মনে কীসের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। যদি আমি আর ফিরে না আসি। যদি নৌকা করে কাটা খালের পাড়ে আমার লাশ ফিরে আসে। কিন্তু তিনি তা বলছেন না। পাছে যদি মুখের কথা

সত্য হয়ে যায়। তখনতো নিজেকে দ্বিগুণ দোষ দিবেন, আর কত-গুণ ব্যথা পাবেন, তাতো বোঝাই যাচ্ছে। তিনি এমন ভাবে সন্তানকে আলিঙ্গন করছেন, যেন এক হাজার বছর তাকে কাছে পাওয়ার সব সন্তুষ্টি এক রাতে তুলে নিতে চান।

"সায়েরা খাতুন," আব্বা আমার অন্য পাশ থেকে বলেন। "আল্লাহ তোমাকে এত কষ্ট দিবেন না। তোমার ছেলে সুস্থ্য হয়ে ফিরে আসবে।"

আমার বুকের মধ্যে আম্মার মাথাটা কেঁপে ওঠে। আমি জানি আম্মা কান্না দমনের চেষ্টা করছেন। তাতে শুধু শব্দটা বন্ধ হয়। আমি টের পাই মায়ের অশ্রু।

সারা রাত আম্মা শুধু একটা কথা বললেন, আমার আব্বাকে, "আপনি ঠিক মতো খাওয়াদাওয়া করবেন।"

সকাল বেলা আমার জননী স্বাভাবিক। আমি তাঁকে চিনি। আমি জানি তাঁর বুক ফেটে যাচ্ছে সন্তানের অনিশ্চিত জীবনের আশঙ্কায়। কিন্তু এই নারী ইস্পাতের তৈরি। জনসমক্ষে তিনি তাঁর বেদনা প্রকাশ করবেন না। যখন আমরা কোলকাতার পথে, নিস্তব্ধ রাতে, তিনি তাঁর ভালোবাসা ঢেলে দিয়ে কাঁদবেন, আর আল্লাহর কাছে ছেলের জীবন ভিক্ষা চাইবেন।

দুপুর বেলা সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে -- মা, শাশুড়ি, স্ত্রী ও অন্যান্য আপনজন দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে -- খালের পাড়ে গেলাম। সবুজ কচুরিপানার মাঝে ভাসমান কালো নৌকাখানা আমাদের জন্য তৈরি ছিল। লুঙ্গির কাছা মেরে কোমর পানিতে নেমে বাড়ির কাজের লোক জয়নাল তক্তার পাটাতন শক্ত করে ধরে আছেন। প্রথমে শাশুড়িকে পরে আম্মাকে সালাম করি। আম্মা আমাকে আর এক বার আলিঙ্গন করেন। মনে হলো, দেহটা না দিলেও, তিনি তাঁর আত্মাটা আমার ভেতর প্রবেশ করিয়ে দিলেন। যেন জননীর প্রাণ সারাক্ষণ আমাকে বিদেশে জড়িয়ে রাখে। কিন্তু এ নারী অতিরঞ্জনও পছন্দ করেন না। তিনি আমাকে ঠিক সময়ে ছেড়ে দেন।

প্রথমে আমি নৌকায় উঠি, তারপর আব্বা। জয়নাল আমাদের স্যুটকেস দুটো আগেই তুলে দিয়েছেন। আমাদের দুই জননী রেণুর হাত দু'টি ধরে আছেন। খালপাড়ে খড়ের গাদার উপর দাঁড়িয়ে ব্যাকুল নয়নে রেণু আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। যতক্ষণ সবাইকে দেখা যায়, ততক্ষণ আমি আর আব্বা কেউ তাঁদের থেকে চোখ সরাতে পারি না।

নৌকা মধুমতির দিকে যেতে থাকে। ঘোপের ডাঙ্গা স্টিমার ঘাটে কুলির সাহায্য নিতে হয়। সারা রাত স্টিমারে চড়ে খুলনা পৌঁছি। এক মুহূর্তও আম্মা

আর রেণুকে মন থেকে সরাতে পারিনি। বার বার মনে হচ্ছিল, কেমন করে আমার জননী রাতটা পার করছেন। রেণু কী ভাবছে? মাত্র এক বছর আগে ওর বাবার মৃত্যু হয়েছে। রেণু বড় দুঃখী একটা মেয়ে। বার বার ওর মুখটা চোখের উপর ভেসে ওঠে।

খুলনা শহরে রেলগাড়িতে উঠি। দ্বিতীয় শ্রেণিতে আমি আর আব্বা পাশাপাশি বসি। আব্বা আমাকে জানালার পাশে বসতে দেন। আব্বার চোখে-মুখে উদ্বেগ, কিন্তু তিনি আমাকে তা বুঝতে দিতে চান না। বার বার টিফিন বাটি থেকে বের করে খাবার দেন। আমি খাই। তিনি খান না। কষ্ট আরও বাড়ে যখন আমি আমার দেশ দেখি। পাকা ধানক্ষেত যেমন পুষ্ট তেমন অপুষ্ট আমাদের কৃষকরা। মনে হলো আমি ওদের পিঠে জমে থাকা লবণের স্তর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি। বুঝলাম, যে ধান তাঁরা কাটেন, তার ভাত তাঁদের পেটে যায় না। স্টেশনগুলোতে অনেককে মাছের ঝাঁকি নিয়ে বসে থাকতে দেখলাম। তাঁদের কেউ জীবনে মাছ খেয়েছেন, এমন মনে হলো না। ক্ষণে ক্ষণে আম্মা আর রেণুর কথা স্মরণ করি। আমি যে অসুস্থ্য সে কথা মনে আসে না। দুই স্টেশনের মাঝে বিস্তীর্ণ গ্রাম দেখি। জলাভূমি দেখি। গাছপালা পশুপাখি দেখি। মানুষ দেখি। যত দেখি তত দেখতে চাই। দেখে দেখে এক দিন কেটে যায়। সন্ধ্যায় আমরা রানাঘাট স্টেশনে পৌঁছি।

ডাক্তার শিবপদ ভট্টাচার্যের চেম্বারে আমি আর আব্বা হাতলবিহীন কাঠের চেয়ারে পাশাপাশি বসে আছি। চেম্বারের বাইরে রোগীর ভিড়। ভেতরে উপসানালয়ের শান্তি আর চন্দনের গন্ধ। ডাক্তার রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট দেখেন। আব্বা আমার কব্জিটা চেপে ধরে আমার মুখের দিকে চান। আমি আব্বার ভেজা হাত অনুভব করি। আব্বা কিছু বলেন না। আব্বার হাসিটা আমার বুকে লাগে। উনিতো আমার কাছে কিছু চান না। উনি শুধু চান আমি বেঁচে থাকি। গত কয়েক দিন আমি অনেক দুর্বলতা অনুভব করেছি। আর ঘুরেফিরে একটা কথাই আমার মনে এসেছে। আমি তা আব্বাকে বলতে চাই। "আব্বা, যদি আমি মরে যাই, আমাকে আমাদের আর রেণুদের ঘরের মাঝের ফাঁকা জায়গাটায় কবর দিয়েন। আমি আপনাদের কাছাকাছি থাকতে চাই।" যদি সম্ভব হত আমি ঘরের মধ্যেই আমার কবর চাইতাম। আপনজনদের কাছাকাছি থাকার এত ইচ্ছা আমার।

না, আমি আব্বাকে কিছু বলি না। কারণ আব্বা সকাল থেকেই ঘামছিলেন। হোটেলে সকাল বেলা আব্বা দুই বার গোসল করেছেন। আব্বা কেন এত বিচলিত সে কথা আমি জানি। আজ তিনি তাঁর বড় পুত্রের জীবন-মরনের সংবাদ শুনবেন। আব্বার বিচলিত হওয়াতো আর আট-দশ জন মানুষের বিচলিত হওয়া নয়। এই পুরুষ শক্ত ধাতুতে গড়া। তাই বুঝি ঘাম ছাড়া তার দেহে আর কোনও প্রতিক্রিয়া নাই। আব্বা বার বার গরমকে দোষারোপ করছিলেন। আমি জানি দোষ গরমের নয়। দোষ অনিশ্চয়তার।

আর তা কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ হবে। আমাদের উল্টো দিকে হাতলযুক্ত কাঠের চেয়ারে বসা ডাক্তার শিবপদ ভট্টাচার্য আমার রক্ত পরীক্ষার রিপোর্টের উপর থেমে চোখ তুলে আমাদের দিকে চান।

আমরা তাঁর দিকে চাই।

"বেরিবেরি," ডাক্তার বলেন।

'বেরিবেরি?" আব্বা নিশ্বাস ছেড়ে বলেন।

আমিও বেরিবেরি রোগের কথা শুনেছি। কিন্তু এ বিষয়ে তেমন কিছু জানি না। আব্বা আবার শক্ত করে আমার হাতটা ধরেন। আমি নিজে কিছুটা হালকা বোধ করি। মনে হয় আরও অনেক দিন আব্বার পরশ পাব। আম্মার পরশ পাব। রেণুর সাথেও দেখা হবে অনেক দিন। আব্বা ডাক্তার বাবুর উপর থেকে চোখ তোলেন না। আমিও কান খাড়া করি।

"ভিটামিন বি'র অভাবে এ রোগ হয়," ডাক্তার বাবু বলেন। "এই রোগ দু'রকমের। আর্দ্র বেরিবেরি আর শুষ্ক বেরিবেরি। আর্দ্র বেরিবেরিতে হার্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আর শুষ্ক বেরিবেরিতে স্নায়ুতন্ত্র।"

"হৃদ্‌যন্ত্রে কোনও ছিদ্র?" আব্বা বলেন। আব্বার চোখ দুটি এমনিতেই বড়। যতক্ষণ আব্বা কথা বলছিলেন, ততক্ষণ ওগুলোর চারিদিকে বুঝি সূর্যের আলো জ্বলছিল।

"না, একেবারেই না," ডাক্তার বাবু জোর দিয়ে বলেন। "তবে হৃৎপিণ্ড কিছুটা দুর্বল হয়েছে।"

"চিকিৎসা, ডাক্তার বাবু?" আব্বা বলেন।

"চিকিৎসা আছে।"

আব্বা আবার আমার মুখের দিকে চান। আমার হাতে একটা চাপ দেন। তারপর হাতটা আস্তে করে ছেড়ে দেন। তারপর আব্বা ডাক্তারের দিকে চান।

ডাক্তার বলেন আমার আর্দ্র বেরিবেরি হয়েছে।

ডাক্তার আমাকে জিজ্ঞেস করেন আমি পেট ভরে খাই না কেন। আমি চুপ থাকি। সত্য কথা হল, আমি কম খাই। ছোটবেলায় চাচিফুফুরা আমাকে এত বেশি ছানা, দই, মাছ, মাংস খেতে দিত যে, এক সময় আমার খাবারের প্রতি বিতৃষ্ণা চলে আসে। আমি অনেক খাবার পুকুরে ফেলে দিয়েছি। অনেক খাবার গরিব বাচ্চাদের বিলিয়েছি। আব্বার কাছে যাওয়ার পর থেকে আহারের প্রতি বিতৃষ্ণাকে আমি আরও বেশি প্রশ্রয় দিই। মূলত দিনে এক বার মাত্র আহার করতাম, রাতে, যখন আব্বা কাজ থেকে ফিরতেন। এখন বুঝলাম, ও রকম করা ঠিক হয়নি।

সে-দিন রাতে আব্বা আম্মার কাছে চিঠি লেখেন। কী লিখলেন তা জানার ইচ্ছে থাকলেও মাকে লেখা বাবার চিঠি যে খুলতে হয় না, সে শিক্ষা আমার ছিল। ঘুমের মধ্যে আমি বার বার জননীর মুখ স্মরণ করি আর শান্তি পাই।

আমি দৃঢ় বিশ্বাস লাভ করি : আমার আম্মাকে আমার মৃত্যু দেখতে হবে না।

আমরা তিন মাস পর বাড়ি ফিরি। আমি অনেকটা সুস্থ্য হয়েছি। বাড়িতে ওষুধের পাশাপাশি আমাকে ভিটামিন বি যুক্ত খাবার দেয়া হয়: গরুর কলিজা, ডিম, ফুলকপি, মিষ্টি আলু, সিমের বিচি, বার্লি, মিষ্টি কুমড়া, ছানা, দই। খালা, ফুফু, চাচিরা খাবার নিয়ে আসেন। আমি আর আগের মতো ফাঁকি দিই না। যতটা পারি খেয়ে নিই। আমি জানি না, কীভাবে কখন তাঁদের ভালোবাসার প্রতিদান দিব। সব চেয়ে বড় পরিবর্তন দেখি শিশু রেণুর চোখে। ও যেন বুঝে ফেলেছে, ওর সাথে আমার জীবন গাঁথা হয়ে গেছে। আমার মনে হয় রেণুর অবচেতনে ওর মনের মধ্যে স্বপ্নের মতো সে বন্ধন বার বার জানান দিয়ে যায়। আমি খুশি থাকি।

আর আজ, আট বছর পর, যখন রেণুকে অনড় দেখি, তখন ভয় হয়। এই আট বছরে রাজনীতি আমার জীবন বদলে ফেলেছে। রেণুর দিকে তাকিয়ে আমি ব্যথা আর শঙ্কা অনুভব করি।

ছত্রিশ সালে আব্বা মাদারীপুর মহকুমায় সেরেস্তাদার পদে বদলি হয়ে আসেন। কোর্ট-কাচারির কাজ। আব্বার সাথে সব অসহায় মানুষের কারবার। আবার জমিদার-জোতদাররাও আব্বাকে সমীহ করেন। আব্বা একজন ফুটবলার এবং তাঁর নিজের ফুটবল টিম আছে। ম্যাচ খেলা ছাড়াও টিমের সাংগঠনিক কাজে আব্বাকে সময় দিতে হয়। আমার অসুস্থতার সময় আম্মা, রেণু আর আর আমার ছোট ভাইবোনরা আমাদের সাথে থাকত। আমি যখন সুস্থ হই তখন তারা আবার আমাদের টুঙ্গিপাড়ার বাড়িতে চলে যায়। এত ব্যস্ততার পরও প্রতি সন্ধ্যায় আব্বা আমাকে নিজে পড়াতেন।

একই বছর আমার চোখের সমস্যা শুরু হয়। বেরিবেরির মতো এই রোগটাও অনেক দিন ধরে একটু একটু করে বাসা তৈরি করছিল। আমি যখন ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিতে শুরু করি, তত দিনে আমি আমার এক হাত দূরে দুই হাতের মতো জায়গায় কিছু দেখতে পাই না। আমাকে ঘিরে রাখে ধোঁয়ার একটা বৃত্ত, যার ফাঁকা কেন্দ্রে আমার অবস্থান।

একদিন আমরা সবাই টুঙ্গিপাড়ার বাড়িতে। আমি আম্মাকে বলি বৃত্তটার কালো কুণ্ডলির মাঝখানে দাঁড়াতে। আম্মাকে জায়গামতো স্থাপন করার পর আমার বুক কেঁপে ওঠে। আমি আম্মার কোমর থেকে গলা পর্যন্ত দেখতে পাই না। মনে হয় জননী আমার ত্রিখণ্ডিত হয়ে আছেন। আর তাঁর কবন্ধ উধাও হয়ে গেছে। আমি এক লাফে আম্মার গলা জড়িয়ে ধরি, তাঁর দেহের হারানো অংশের সন্ধানে, এতটা চঞ্চল হয়েছিলাম আমি। তারপর সে ধোঁয়ার পরিধিতে আব্বা আর ছোট বোন আমেনা আর খোদেজাকে দাঁড় করানো হয়। জয়নালকে দাঁড় করানো হয়। চাচা-চাচি-খালা-খালু-ফুফা-ফুফু সবাই দাঁড়ান। ওই বৃত্তে দাঁড়ালে আমি তাঁদের কারও কবন্ধ দেখতে পাই না। শুধু ছোট ভাই নাসেরকে এই পরীক্ষা থেকে মুক্তি দেয়া হয়। পোলিও রোগে নাসেরের এক

পা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সে ভালো করে দাঁড়াতে পারে না। তা ছাড়া নাসের তখনও ওই অন্ধকারে দাঁড়ানোর জন্য যথেষ্ট বড় হয়নি।

মাদারীপুরের ডাক্তাররা বললেন আমার চোখে গ্লুকোমা হয়েছে। চিকিৎসা না হলে আমি অন্ধ হয়ে যাব। আব্বাকে তাঁর সব কাজ ছেড়ে আমাকে নিয়ে কোলকাতা গমনের উদ্যোগ নিতে হয়।

ওই দিনগুলোতে রেণু সব সময় আমার পিছে পিছে ঘুরত। ছোটবেলায় আমি একটা বানর পুষতাম। বানরটা সব সময় আমার ছায়া মাড়িয়ে চলত। কুকুর, বিড়াল, খরগোশ আর পায়রাও পুষেছি। ওরা আমার সাথে না থাকলে আমার মনে হতো আমার কী যেন নেই। তারপর অসুখ-বিসুখে পড়ে আর বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করাতে ওদের সাথে আমার বিচ্ছেদ ঘটে। তারপর রেণু আমাকে অনুসরণ করে। আমার শূন্যতা পূরণ হয়।

রেণুর পায়ে আওয়াজ নেই। কিন্তু ওর উপস্থিতি আছে। এ ভালো লাগা বুঝানো যাবে না। কাগজেকলমে রেণু আমার স্ত্রী। তবু বলব ওর সাথে আমার যে সম্পর্ক রচনা হয়েছে, তা প্রেমভালোবাসার কন্টকাকীর্ণ সরু গলিতে আছাড় খাওয়ার আগেই অনন্ত পথে পাড়ি দিয়েছে। ফলে আমি আমার অস্তিত্বের মধ্যে এক অনাবিল স্থিতি অনুভব করি। বুঝে বা না বুঝে তখন থেকে আমি আমার জীবনের এই স্থিতিশীলতার জন্য রেণুর কাঝে কৃতজ্ঞ হয়ে পড়ি। এই কৃতজ্ঞতার অনুভূতি আমাকে সুখ দেয়। তখনও ভাবিনি এক দিন রাজনীতি আমার সবটুকু সময় গ্রাস করে নিবে। ফলে তখন শুধু আমার একটাই স্বপ্ন, যথাসময়ে আমার বাবা-মায়ের মতো এক দিন আমিও একটি সুখের সংসার গড়ব। রেণুকে নিয়ে আনন্দে দিন কাটাব।

আজ রেণু কিশোরী হয়েছে, চারিদিকে বাসরের আয়োজন চলছে, অথচ আজ রেণুর চোখে এক অদৃষ্টপূর্ব ভার। মনে হলো জীবনটা জটিল হয়ে গেল। আমি ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করি। হয়তো ব্যাপারটা তা-ই, যা আমি মনে মনে ভাবছি। হয়তো আমার কর্মব্যস্ততার সাথে রেণুর ভয় ও শঙ্কার যোগ আছে। পরাধীন দেশে জন্ম নেয়ার দুর্ভাগ্য সব নাগরিককেই বহন করতে হয়। আর সেই দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে লড়ে কেবল গুটিকতক মানুষ। আমি তাদের দলে ভিড়ে গেছি। এখন যদি আমি বের হয়ে যাই, কেউ আমাকে কিছু বলবে না। কিন্তু তা-তো হবে আমার নিজের সাথে নিজের বিশ্বাসঘাতকতা। আমার কাজের জন্য রেণুর প্রেরণা দরকার, দরকার অনুমোদনের। অথচ মনে হচ্ছে রেণু তার হাত গুটিয়ে নেবে।

সেই হাত, যা সব সময় বাড়ানোই ছিল। সে জন্যই আজ রেণুর জন্য আমার এত মায়া। ও যতক্ষণ স্বাভাবিক হবে না, ততক্ষণ আমিও শান্তি পাব না। এত দিন আমি আর রেণু কথা বলেছি আত্মার ভাষায়। আজ যখন জবানের প্রয়োজন,

তখন আমি রেণুকে বোঝানোর মতো কোনও কথা আমার মধ্যে খুঁজে পাচ্ছি না।

যে দিন বাড়ির সবাইকে নিয়ে আমাকে-ঘিরে-থাকা-ধোঁয়ার বৃত্ত পরীক্ষা করলাম, সে দিন সেই বৃত্ত রেণুর মতো এত বেশি আর কেউ পর্যবেক্ষণ করেনি। তারপর দিন তিনেক রেণু আমাকে পদে পদে অনুসরণ করে। এক দিন দুপুরে রেণু আমাকে আম্মার ঘরে পায়। ও নিশ্চয়ই খেয়াল করেছে আমি দিনে কয়েক বার আম্মার ঘরে যাই। পরিপাটি ঘরটা আমার খুব প্রিয়। ওই দিন বিছানায় হলুদ চাদর, টান টান করে বিছানো। শান বাঁধানো কালো মেঝেটা প্রতি দিন ধোয়া-মোছা করা হয়। কোথাও এক বিন্দু ধুলা নাই। বালিশগুলো বোধ হয় রোদে শুকাতে দেওয়া হয়েছে। আমি বুক ভরে আতর আর জর্দার সুগন্ধে শ্বাস নিই। এর মধ্যে সেই কাণ্ড ঘটে। রেণু আমার হাত দুটি টেনে ধরে। আর ওর মাথা উঁচু করে আমার দিকে চায়। রেণুর মুখের সাদা রঙের মাঝে উদ্বেগাকুল বাদামি চোখ। মনে পড়ে রেণুর জন্মের দিন বড় হইহুল্লা হয়েছিল, কারণ টুঙ্গিপাড়ার মানুষ এত সুন্দরী নবজাতিকা কখনও দেখেনি। সেই নবজাতিকার ভাগ্য প্রসন্ন ছিল না। রেণুর যখন তিন বছর বয়স তখন ওর আব্বা মারা যান। তার দুই বছর পর, অর্থাৎ আমার চোখের অসুখ ধরা পড়ার এক বছর আগে, ওর আম্মা আমাদের ছেড়ে চলে যান।

রেণুর আম্মা দুই মাস জ্বরে ভুগেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে আমাকে গোপালগঞ্জ থেকে টুঙ্গিপাড়ার বাড়িতে আনা হয়েছিল। কারণ তিনি শুধু আমার চাচিই নন, শাশুড়িও বটে। বড় করুণ মৃত্যু, আমার চোখের সামনে ঘটে, সেটা আমার জীবনে দেখা প্রথম মৃত্যুও বটে। রেণুর আম্মার জীবনের শেষ পনেরোটা দিন আমি দেখলাম কীভাবে তাঁর দেহটা আমাদের চোখের সামনে পরিবর্তন হতে থাকে। এক সময় চাচিকে মনে হচ্ছিল কোনও এক প্রাচীন মিশরীয় রানির মমি। আমার অন্তরে যেটা সবচেয়ে বেশি বেজেছে সেটা হলো তাঁর গায়ের রঙের পরিবর্তন। উজ্জ্বল থেকে নীলাভ কালো। আর ত্বকের ভাঁজগুলোর আবির্ভাব ছিল বড় অবিশ্বাস্য। তারপরও শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার আগে চাচির মুখে শান্তি নেমে এসেছিল। আর আমরা সবাই তা প্রত্যক্ষ করেছিলাম।

চাচির মৃত্যুর দিন দুয়েক আগের কথা। সে দিন রেণু আমার আম্মার ডান কোলে বসে তার মায়ের শীর্ণ মুখখানা দেখছিল, আর আমার আম্মার বাম হাতে ধরা ছিল রেণুর বোন জিন্নাত, যে রেণুর চেয়ে দুই বছরের বড়। রেণুর বাবার মৃত্যুর পর রেণুর মতো জিন্নাতকেও বিয়ে দেয়া হয়েছিল, আমারই এক অগ্রজ চাচাত ভাই শেখ মোহাম্মদ মুছার সঙ্গে। রেণুর ওই বেদনাবিধূর চাহনি দেখে সেদিন আমি গোপনে অশ্রু ত্যাগ করেছিলাম। ওরা দু'টি বোন আমাদের চোখের সামনে এতিম হয়ে গেল।

ফিরে যাই আমার চোখের অসুখের সময়টায়। ছয় বছরের রেণু যে দিন আমার হাত টেনে ধরেছিল, সে দিন যেন সে আমার জীবনের লাগামও হাতে নিল।

"দুলা, তুমি আর আসবা না?" রেণু আমাকে হস্তগত করার পর বলেছিল। সে সময় আমি ওর চোখের দিকে চেয়ে থাকি। আর একটা ব্যথা আমার বুকের ছাতির ভেতর থেকে ছুরির ফলার মতো করে কয়েকটা আঁচড় দিয়ে যায়। তিন বছর বয়স থেকে রেণু ভেবে এসেছে, আমার নাম দুলা। এর মধ্যে রেণু জেনে গেছে দুলা শব্দের অর্থ কী। আমি বুঝলাম এর মধ্যে ওই জটিল সম্পর্কের ভার, ব্যথা, ভয়, অনিশ্চয়তা নামক কাঁটাসমূহ রেণুর নিঃসঙ্গ হৃদয়কে অনেক বিদীর্ণ করেছে। আমি বুঝলাম, চিকিৎসার জন্য যে কোলকাতা যাচ্ছি, ওই বিচ্ছেদ চির-বিচ্ছেদ কি না, তা ভেবে রেণুও আমার জননীর মতো দুঃখের যাঁতায় পিষ্ট হয়ে চলেছে। আমি রেণুকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করি।

"আমি কিছু দিন পরেই ফিরে আসব, রেণু," আমি বলি।

"তুমি চলে আসবা," রেণু বলে। "যদি তুমি দেখতে না পাও, সমস্যা নাই। আমি সব কিছু দেখতে পাই।"

আমি রেণুর দিকে চাই আর আমার গাল বেয়ে কয়েক ফোঁটা গরম অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

"কাঁদছ কেন, দুলা?" রেণু বলে। "আমি সব দেখতে পাই।"

"আমি কাঁদছি না, রেণু।"

"তুমি কাঁদছ।"

"আমার যে চোখ খারাপ।"

"তুমি কবে ফিরে আসবা?"

"খুব শীঘ্র।"

"চলে আসবা।"

ছয় বছর আগের সে ঘটনা আজও আমার মনে দেদীপ্যমান।

চোখের চিকিৎসার জন্য কোলকাতার উদ্দেশে বাড়ি ত্যাগ করার আগে সবার থেকে বিদায় নিচ্ছি। এবারও রেণু আগের মতো আমার দিকে চেয়ে থাকে। আমি ছাড়া শুধু আর এক জনের চোখে তা ধরা পড়ে। তিনি হলেন আমার আম্মা। আম্মার সাথে আমার চোখের মিলন হওয়ার পর আম্মার মুখও আরক্ত হয়।

যে বিষয়টা সবচেয়ে বেশি করে বুকে বাজছিল, তা হলো রেণুর মায়ের অনুপস্থিতি। আজ রেণু দাঁড়িয়ে আছে ওর দাদার হাত ধরে। রেণুর বয়োবৃদ্ধ বার্ধক্য-জীর্ণ দাদাকে দেখে আমার বুকে ধাক্কা লাগে। মনে হলো রেণুর জন্য হলেও আমাকে বেঁচে থাকতে হবে। বুকের পাঁজর শক্ত করে ধরে রেখে আমি ওর দিকে হাত নাড়ি।

দুই বছর আগের সেই একই পথ ধরে, নৌকা, স্টিমার, আর ট্রেনে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আব্বা আর আমি দু'টি স্যুটকেস নিয়ে আমার মেজ বোন আছিয়া বেগমের কোলকাতার বাড়ির দরজার সামনে হাজির হই। এবার আর হোটেলে থাকতে হবে না। কারণ দুলাভাই খুলনা থেকে বদলি হয়ে কোলকাতায় এসেছেন। কোনও তরফেই ভাঙতি না থাকায় ট্যাক্সি চালক দুই টাকা বেশি পান। দুলাভাই দরজা খুলে আমাদের সামনে দাঁড়ান। সাদা শার্ট আর খয়েরি রঙের বন্ধনীযুগ দিয়ে সংযুক্ত করে কালো প্যান্ট পরা দুলাভাই আমার স্যুটকেসটা টেনে ভিতরে নেন। তিনি অডিট বিভাগের অ্যাকাউন্টস অফিসার। বুঝলাম তিনি অফিসে যাওয়ার জন্য তৈরি ছিলেন আর আমাদের আগমন তাঁকে বাধাগ্রস্ত করেছে। দুলাভাই আব্বাকে আলিঙ্গন করে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। আমার মেদহীন শরীরে মধ্যবিত্ত পরিবারের সুখী পুরুষের স্ফীত পেটের চাপ। দুলাভাইয়ের হাস্যোজ্জ্বল মুখ দেখে মন ভরে যায়।

আছিয়া বুবু আব্বাকে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করেন আর তারপর আমাকে বুকে টেনে নেন। ওঁর তখনও কোনও সন্তান না হওয়ায় আব্বা আম্মা দুজনেই চিন্তিত। বুবু আমাদের পেয়ে কোনটা রেখে কোনটা করবেন বুঝতে পারছিলেন না। ঘরকন্নায় তাঁর দক্ষতা অসীম। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখি তিনি যেন একের মধ্যে অনেক মানবী। রান্নাঘরে চায়ের পানি চড়ানো, আমাদের সুটকেসগুলো খোলা, বারান্দায় ভেজা কাপড় মেলে দেওয়া, বাথরুমের দরজার পাশে সাবান নিয়ে দৌড়ানো, বাগান থেকে রজনীগন্ধ্যা কেটে এনে বৈঠকখানার টেবিলের উপর ফুলদানিতে রাখা, ইত্যাদি কাজ বুবু যেন এক সাথে করে যান। আমি ভাত খেতে চাইলাম বলে তিনি হাঁড়িতে ভাত চড়িয়ে দেন। কাজের মেয়ে খায়রুনকে দিয়ে লুচি ভাজান। "তাড়াতাড়ি কর্," বুবু ধমক দেন। "দুই দিন আগে বাড়ি থেকে বের হয়েছে। রাস্তার খাবার কি আমার বাপ ভাইয়ের জন্য?"

আমরা কাপড় বদলে হাত মুখ ধুয়ে ড্রয়িং রুমে বসার পর দুলাভাই বিদায় নিয়ে অফিসের জন্য বের হয়ে যান। আছিয়া বুবু আমাদের লুচি, সবজি ভাজি, সিদ্ধ ডিম আর ডালের হালুয়া খেতে দেন। আমার পাতে লুচি শেষ হয় না, কারণ আমি একটা শেষ করার আগে আমার বোন আর একটা আমার প্লেটে অতি সন্তর্পনে চালান করে দেন। আব্বার জন্য আছিয়া বুবু যত্ন করে চায়ে চিনি গোলেন। সবচেয়ে ভালো লাগল ওঁর মুখের হাসি। আব্বাকে বুবু দুই কাপ চা খাওয়ান। জ্বাল দিয়ে ঘন করা খাঁটি গরুর দুধ মিশিয়ে বানানো শিলংয়ের পর্বতের সুগন্ধযুক্ত সুস্বাদু চা। আমাদের খাওয়া শেষ হওয়ার পর বুবু এক বার আমাকে ঘিরে থাকা ধোঁয়ার বিত্তের মধ্যেও দাঁড়ান। তারপর ওঁর মুখে ছায়া নেমে আসে। তারপর ভাইকে জড়িয়ে ধরে অশ্রুপাত।

বোনের বাড়িতে থাকলাম। আব্বা আর দুলাভাই মিলে আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন। কিছুদিন পর ডান চোখের অপারেশন করা হলো। তার দশ দিন পর বাম চোখের। দুই মাসের মধ্যে ব্যান্ডেজ খোলা আর ক্ষত শুকানো শেষ হয়। আর আশার সঞ্চার হয় মনে। আমি অন্ধ হব না।

চশমা পরে কোলকাতা থেকে টুঙ্গিপাড়ার বাড়িতে যে দিন ফিরে এলাম, সে দিন রাতে আম্মা আমাকে জড়িয়ে ধরে আর ছাড়তে চান না। "খোকা রে, কেন অসুখের নজর বার বার তোর উপর পড়ে? কেন রে বাপ? কী পাপ করেছিলাম আমি? কী পাপ করেছিলেন তোর আব্বা?" জননী বুঝি আর কখনও আমাকে তাঁর বুক থেকে ছাড়বেন না। ছেড়ে দিলেই বুঝি আর একটা অসুখ এসে তাঁর স্থানটা দখল করে নেবে। জননীর অশ্রুধারা লুকিয়ে আমার বুকের উপর গড়িয়ে পড়ে, আমার পরিচ্ছদ তা শুষে নেয়।

একদিন দুপুরে গরুর কলিজা-ভুনা আর রুই মাছের মুড়িখণ্ড দিয়ে ভাত খেয়ে কম্বল গায়ে জড়িয়ে বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছি আর জানালার বাইরের বৃষ্টি দেখছি। আষাঢ় মাসের ঘন বৃষ্টি। হলুদ রঙের জামা পরা রেণু বিছানায় যোগাসনে বসে বার বার আমার চোখ পরীক্ষা করে। আমার চারিদিকে ঘিরে থাকা ধোঁয়ার বৃত্তের কথা বলে। ধোঁয়া কই? অন্ধকার কই?

"একেবারে চলে গেছে?"

"হ্যাঁ, রেণু," আমি বালি। "একেবারে চলে গেছে।"

রেণু পরীক্ষা করতে চায়। ওর ছোট হাত দুটি আমার চোখের দিকে বাড়িয়ে দেয়। আস্তে করে চশমাটা খুলে আনে। ওর হাতের দক্ষতা নিয়ে আমার আনন্দ হয়। এক সময় যে বৃত্ত আঁধারে ঘেরা ছিল, রেণু সে বৃত্তের অনেক সন্ধান করে, আর বার বার আমাকে জিজ্ঞাসা করে, আমি দেখতে পাই কি না। আমি দেখতে পাই, তবে চশমা না পরলে দেখতে একটু কষ্ট হয়। আমি ওর হাত থেকে চশমাটা নিয়ে পরি। রেণু ওটার দিকে অপলকে তাকায়। ওর যে চোখ, তাতে যদি কোনও আবেগের প্রকাশ থাকে, তা যে কেউ আমলে নিতে বাধ্য। এমন চোখ টুঙ্গিপাড়া কেন, সারা বাংলাদেশে নাকি দ্বিতীয় জোড়া নাই। সে কথা এখন থাক। তবে রেণুর চশমার প্রতি বৈরিতা দেখে মনে হয় ওটা বুঝি কোনও মারনাস্ত্র। আমারও চশমা পড়তে ভালো লাগে না। কিন্তু কিছু করার নাই।

"এখন কি তুমি আবার চলে যাবা?" রেণু বলে।

"যেতে হবে যে, রেণু। আমাকে আবার পড়াশুনা শুরু করতে হবে।"

আমার কথা শুনে রেণুর মুখে একটা কালো ছায়ার পর্দা পড়ে।

টুঙ্গিপাড়ায় কিছু দিন কাটিয়ে আব্বার সাথে মাদারীপুর ফিরে এলাম। আম্মার উপর রাগ হলো। আম্মা টুঙ্গিপাড়া ছাড়তে চান না। না হলে, রেণু আর আম্মা মিলে আমরা সবাই আব্বার সাথে মাদারীপুরে থাকতে পারতাম।

মাদারীপুরের বাসায় আমার কর্মহীন দিন কাটতে চায় না। আলস্য আমার জীবনে কোনও দিনও ছিল না। এখন ঘুম থেকে ওঠার পর আবার বিছানায় যাই। লম্বা হয়ে শুয়ে থাকতে গেলে আমার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। বিছানার খুঁত ধরি। জাজিমের ভেতর নারিকেলের ছোবড়া আমার পিঠে খোঁচা মারে। বসে থাকলে মনে হয়, বাইরে যাই না কেন? বাড়ির ভেতর ঘুরতে ঘুরতে লেবু, পেয়ারা আর আতা গাছের নিচে হাঁটার পথ বানিয়ে ফেলেছি।

একদিন হাবু শেখের রান্না করা হরিণের মাংস আর মাসকলাই ডাল দিয়ে ভাত খেয়ে এক ছড়া পাকা সবরি কলা আর ত্রিশ সালে ইংরেজ সরকার দ্বারা নিষিদ্ধ করা কবি নজরুলের 'প্রলয়শিখা' কাব্যগ্রন্থখানা সামনে নিয়ে জানালার

পাশে বসি। কিছুক্ষণ আম্মা আর রেণুর কথা ভাবি। তারপর কবিতার দিকে মনোযোগ দিই। গানের পর যে জিনিসটা আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি, তা হলো কবিতা। বিদ্রোহী কবির কাব্য আমার মনকে চার দেয়ালের বিরুদ্ধে উত্ত্যক্ত করতে থাকে।

হইল প্রভাত বিংশ শতাব্দীর,
নব-চেতনায় জাগো, জাগো, ওঠো বীর!

নব্য ধ্যান নব্য ধারণায় জাগো
নব প্রাণ নব প্রেরণায় জাগো,
সকল কালের উচ্চে তোলো গো শির,
সর্ব-বন্ধ-মুক্ত জাগো গো বীর!

ঘরে কবিতা। বাইরে মিছিল, যা কিছু সময় ধরে কান দিয়ে অনুসরণ করছিলাম। ক্ষুব্ধ জনতা টাউন হলের দিকে এগিয়ে আসছে। কবিতার দোলায় আর মিছিলের টানে ঘরের বাঁধন ছিঁড়ে যায়। আমি সন্তর্পণে বের হয়ে যাই। উঠানটা পার হওয়ার সময় বুকের মধ্যে যেন সাগরের ঢেউ আছাড় মারে। যখন গেট বন্ধ করে ভিড়ের মধ্যে মিশে যাই, তখন শিহরনে আমার গা কাঁপে।

আকাশে অসহ্য রোদ। আমি আমার চশমার কাচে উত্তাপ অনুভব করি। শ্রাবণের গরমে মিছিলকারীরা ঘামছেন। কিন্তু সে দিকে কারও খেয়াল নেই। সবাই ইংরেজের পতন চান। এক সময় আমি তাঁদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাই। গলা ফাটিয়ে মিছিল করি।

সাদা আদমি ইংরাজ
এই মুহূর্তে ভারত ছাড়।
সাদা আদমি ইংরাজ
এই মুহূর্তে ভারত ছাড়।

মিছিল শেষে বাসায় এসে গোসল করি।

আব্বা বাসায় ফেরেন। অফিসের পোশাক ছেড়ে গোসল করে লুঙ্গি পাঞ্জাবি পরে পাকঘরে আসেন। আমরা দুজন মাদুরের উপর বসি। হাবু শেখ হরিণের মাংস ছাড়াও কবুতরের মাংস আর মিষ্টি কুমড়া ও চিংড়ি মাছের তরকারি পরিবেশন করেন। হাবু শেখ সাদা ভাত দিয়ে আব্বার জন্য বড়

কাঁসার পাত পূর্ণ করেন। ব্যস্ততার কারণে সকালে ও দুপুরে আমার পিতার ভালো করে খাওয়া হয় না। তাই রাতে তিনি তৃপ্তিসহকারে আহার করেন।

আমি আব্বাকে বলি, আমি মিছিলে গিয়েছিলাম।

আব্বা আমার দিকে চোখ তুলে চান। আমি মাথা নিচু করি।

"এখনওতো তোমার চোখ পড়াশোনা শুরু করার জন্য উপযুক্ত হয়নি।"

"আমি সুস্থ, আব্বা। সারা দিন বাসায় থাকতে ভালো লাগে না। বিকালে আমি জনসভায় যেতে চাই।"

"কেন, খোকা?"

"আন্দোলনে গতি এসেছে। ইংরেজদের তাড়ানোর এটাই সময়।"

"সারা ভারতবর্ষ চায় ইংরেজরা চলে যাক," আব্বা যেন নিজেকে বলেন। "তারপরও ওদের কৌশলের কাছে আমাদের নেতারা নিরুপায়।"

আব্বা যা বলেন না, তা হলো, ইংরেজদের সাথে আমাদের শেখ গোষ্ঠীর শুধু রাজনৈতিক বিরোধিতাই নয়, পারিবারিক বৈরিতাও রয়েছে।

আমার এক প্রপিতামহ, শেখ কুদরতুল্লাহ, খুলনার আলাইপুরের ইংরেজ নীলকর মিস্টার রাইনের বিরুদ্ধে শেখদের এবং এলাকার অন্যান্য ব্যবসায়ীর নৌকার মাঝিদের জোর করে নীল খামারে কাজ করানোর বিরুদ্ধে মামলা করেন। বিবেকবান ইংরেজ বিচারক রাইনের বিরুদ্ধে রায় দেন আর শেখ কুদরতুল্লাহকে বলেন যত টাকা ইচ্ছা রাইনের থেকে ক্ষতিপূরণ চাইতে, তা হলে তিনি তা অনুমোদন করে দিবেন। শেখ কুদরতুল্লাহ কোনও কিছু দাবি না করে রাইনকে শুধু আধা পয়সা জরিমানা দিতে বলেন।

সে রাতে মিস্টার রাইন এসে শেখ কুদরতুল্লাহর পায়ের উপর পড়েন। বলেন, "শেখ, ইংরেজদের কাছে আমার মান-ইজ্জত নষ্ট কোরো না। সবাই জেনে গেছে তুমি আধা পয়সা জরিমানা চেয়েছ আমাকে অপমান করার জন্য। তুমি তোমার মত পাল্টাও, শেখ। যা চাও সব নিয়ে নাও। আমার পুরো নীলখামার, কুঠি, সব। শুধু আমার সম্মানটা রক্ষা করো।" রাইন বলেন তিনি শেখ কুদরতুল্লাহর পা ছাড়বেন না। শেখ কুদরতুল্লাহ বলেন, "রাইন, বাইরের কেউ দেখলে তোমার অপমান হবে।" রাইন বলেন, "কেউ দেখবে না। রাতের বেলা এই বাড়িতে তুমি আর আমি। আরতো কেউ নাই।" মিস্টার রাইন শেখ কুদরতুল্লাহর হাঁটুর উপর মাথা কুটেন। শেখ কুদরতুল্লাহ তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেননি।

ওই সময় শেখদের সাথে জমিদার রানি রাসমণির কয়েকটা তালুক নিয়ে বিরোধ চলছিল। প্রতিশোধ হিসাবে রাইনের লোক রানি রাসমণির পক্ষ নেন। তখন আর ইংরেজ আর বাঙালিতে লড়াই নয়, বাঙালি-বাঙালিতে লড়াই। এ

লড়াইয়ে শেখরা সর্বস্বান্ত হন।

ঘটনাচক্রে আমি আমার পাঁচ বছর বয়সে রাইনের এক উত্তরসূরীর অত্যাচারের নমুনা নিজ চোখে দেখেছিলাম। সে বিষয়েও আব্বার সাথে অনেক আলাপ হলো। আব্বা মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনেন। পাঁচ বছর বয়সে যে স্বদেশি বিপ্লবী পূর্ণ দাস বাউলকে রাইনের বংশধরের সাথে লড়তে দেখেছি, তিনি এখন আমরা যারা কিশোর আর যুবক, তাদের হিরো। বিদ্রোহী কবির ভাষায় তিনি হলেন মাদারীপুরের 'মর্দবীর'। অনেকেই তাঁর মতো হতে চায়। আমি চাই আমার আব্বা আমার আকাঙ্ক্ষার অনুমোদন দিক। তাই আমার মনের কথাটা তাঁকে আর একটু খুলে বলি।

"আব্বা, আমি স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে চাই।"

আব্বা নীরবে আহার করেন। আমার হাতখানা পাতের উপর অচল হয়ে পড়ে থাকে। জানি না আব্বা কোনও অশুভ আশঙ্কা করছিলেন কি না। তিনি হয়তো আমার স্বাস্থ্যের কথা ভাবছিলেন। দুই-দুইবার অসুখে পড়া। আরও কত কী? আব্বা চুপ থাকাতে আমার অস্থির লাগে।

"আব্বা, আপনি কি রাগ করলেন?"

"বংশের মর্যাদা পায়ে ঠেলে আমাকে আদালতে একটা ছোট চাকরি করতে হয়।" স্নেহাকুল চোখে আব্বা আমার দিকে চান। "পরিবারের জন্য। ভাইবোনদের জন্য।"

আমি মাথা নিচু করি। আমার প্রপিতামহরা সবাই জমিদারের জীবন যাপন করেছেন। কাগজেকলমে আমরা এখনও জমিদার। তবে পুরনো দিনের সচ্ছলতা আর নাই। রোজগারের তাগিদে আব্বাকে পারিবারিক প্রথা ভেঙ্গে চাকরি করতে হয়। এ ধরনের আত্মমর্যাদাবোধ ভালো কি মন্দ সেটা বিচারের ভার তৃতীয় পক্ষের। এ ব্যাপারে গুরুদেবের কথাই সত্য মানি। "ঘা-খাওয়া বংশ, ঘা-খাওয়া নেকড়ে বাঘের মতো, বড়ো ভয়ংকর।" আমি পিতার মনোকষ্ট উপেক্ষা করতে পারি না। তারপরও আমি তাঁর দিকেই কান পেতে রই।

"আমি চাই তুমি পড়ালেখা শেষ করে উকিল হও," আব্বা বলেন। "কোর্টে একমাত্র দাপট উকিলদের। আমি কল্পনা করি তুমিও এক দিন উর্দি পরে কোর্টে দাঁড়িয়েছো। তোমাকে দেখে জাঁদরেল সব জজ সাহেবরা ঘামছেন।"

উকিল হওয়ার কোনও ইচ্ছা আমার মনে জাগে না। সারা বাংলাদেশের তরুণরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত। আমার তাদের দলে যোগ দিতে ইচ্ছে করে। পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করা হবে না জেনে বুক ভারী হয়। কী করব বুঝতে

পারি না। আব্বা কথা চালিয়ে যান, ওটাই সুখ।

"আমিতো চাই, খোকা, আমার একটা ছেলে দেশের সেবা করুক। কিন্তু তোমাদের দুই ভাইয়ের কেউ সেই শক্তি আর স্বাস্থ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করোনি।"

"আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ্য, আব্বা।"

আব্বা কিছুক্ষণ নীরব থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন। বলেন, "তোমার মায়ের কথাটা মনে রেখো। বউমার কথাও।"

"আব্বা, আমি সব দিক সামলাব।"

আব্বা এক মুহূর্ত চুপ থেকে বলেন, "শুনে ভালো লাগল, খোকা।"

"আপনি দেখবেন, আব্বা।"

"একটু সময় নাও। আর একটু সুস্থ্য হও।"

"বাইরেতো সংগ্রাম চলছে, আব্বা।"

আব্বা না চাইলেও যেন তাঁর মাথাটা উপর-নিচ হয়ে যায়। আমি শৈশব থেকেই আলাদা, আব্বা এ কথাও বলেন। শুনে আমার ভালো লাগে। আমার সংগ্রামে অংশ-গ্রহণের বাসনা আরও বৃদ্ধি পায়।

"বাধা দেব না," আব্বা বলেন। "তবে পড়াশুনাটা তোমাকে করতে হবে। আমাদের দেশের অনেক নেতা পেশায় বড় উকিল। হক সাহেব, সোহরাওয়ার্দী সাহেব–"

"নেতা হিসাবে সুভাষ বসুকে আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে, আব্বা। আমার চেয়েও ছোট ছোট ছেলেরা তাঁকে অনুসরণ করে।"

আব্বা বলেন সুভাষ বসু অনেক বড় নেতা। আমিও তা জানতাম। সুভাষ বসু সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ছেড়ে এখন ঐক্যবদ্ধভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার কথা বলছেন। সেই জন্যই আমি তাঁর প্রতি অনুরক্ত হই।

"অন্য হিন্দু নেতারা মুসলমানদেরকে ভালো চোখে দেখেন না," আব্বা বলেন। "মুসলমানদের সামনে কঠিন সময়, খোকা।"

"তা হলে আপনি অনুমতি দিলেন, আব্বা?"

আব্বা কিছু বলেন না। আমি বুঝি, আমাকে ওকালতি পেশায় প্রতিষ্ঠিত দেখার জন্য আমার পিতার যতটা আগ্রহ, আমাকে এক জন দেশ-সেবক হিসাবে দেখার প্রতিও তাঁর সমান আকাঙ্ক্ষা। ফলে আমি কোন পথ বেছে নেব, তা আব্বাও স্থির করে বলতে পারছিলেন না।

সাঁইত্রিশ সালে আব্বা আবার গোপালগঞ্জে বদলি হন। আমার চোখের সক্ষমতা পড়াশোনা শুরু করার মতো অবস্থায় আসে। আমি মিশন স্কুলে ভর্তি হই। রেণুও মিশন স্কুলে ভর্তি হয়। এত দিন আম্মা টুঙ্গিপাড়ার বাড়িতেই

থাকতেন। আমার নানার অনেক সম্পত্তির উত্তরাধিকার ছিল আমার আম্মার। আম্মা ভাবতেন সম্পত্তি দেখাশোনা না করলে নানা কবর থেকে তাঁকে অভিশাপ দিবেন। পুরনো কালের জমিদারি, বিত্ত-বৈভব, শানশওকত হারানোতে শেখরা নিজেদের মধ্যেই বিয়েশাদির ব্যবস্থা করে যা কিছু অবশিষ্ট ছিল তা যাতে নিজেদের মালিকানায় থাকে, সে চেষ্টা করতেন। গোষ্ঠীর ভিতরে দাম্পত্য সম্পর্ক রচনা করার বিষয়ে শেখরা যে সত্যটা সবচেয়ে কম উচ্চারণ করতেন, তা হলো বংশ-গরিমা, যা সংরক্ষণের জন্য তাঁদের চেষ্টার অন্ত ছিল না। রেণুকে স্কুলে ভর্তি করানোর পর আম্মা গোপালগঞ্জ আসতে বাধ্য হন। গোপালগঞ্জের টাউন হলের কাছে জমি কিনে আব্বা টিনের ঘর তোলেন। আমাদের পুরো পরিবার গোপালগঞ্জে বাস করতে থাকে।

বিকালে স্কুল থেকে এসে মিছিলে যাই। মিটিংগুলোতে সবার আগে পৌঁছি আর সবার শেষে মিটিংয়ের স্থান ত্যাগ করি। চশমাটা আশির্বাদ হয়ে দেখা দেয়। চশমা আর গোঁফের কারণে মানুষের চোখে আমাকে বয়সের তুলনায় অধিকতর পরিপক্ক বলে মনে হতে থাকে। ইংরেজরা চলে গেলে রেণুকে নিয়ে আব্বা আম্মার মতো সংসার করব এটা তখনও ভাবতাম। এ সময় আব্বা হামিদ মাস্টারকে আমার গৃহশিক্ষক নিয়োগ করেন।

হামিদ মাস্টার বিপ্লবী মানুষ। তিনি সমাজতন্ত্র চান। ইংরেজদের ঘৃণা করেন। তিনি আমাকে সমাজে বিদ্যমান অনাচারের প্রতি তাকাতে বলেন। মানুষ কেন খাবার পাবে না? মানুষ কেন উলঙ্গ থাকবে? শিশুরা কেন অপুষ্টিতে মারা যাবে? জ্বর হলে কেন সে পথ্য পাবে না? আরও আরও কত রোগে সে মারা যায়, সে নিজেও জানে না। মানুষ কেন রাস্তার পাশের সবুজ ঘাস কিংবা নদীর পাড়ের বালুতট নোংরা করবে? কেন তার জন্য ঘর, আহার, পোশাক, চিকিৎসা আর শৌচাগার থাকবে না?

হামিদ স্যার আগে থেকেই দাতব্যের কাজ করতেন। ছোটবেলা থেকে গরীব-দুঃখীকে সাহায্য করা আমারও অভ্যাস। হামিদ স্যারের দাতব্যের কাজ আমাকে আকর্ষণ করে। আমি তাঁর সাথে যোগদান করি। আমরা বাড়ি বাড়ি যাই। এক মুট ধান, আধ মুট চাল, দুই আনা, চার আনা পয়সা ইত্যাদি চাঁদা তুলে যা সঞ্চয় হয় তা দিয়ে গরিব ছাত্রদের বইপত্র কিনে দিই।

জীবনটা ভালোই চলছিল। তারপর আটত্রিশ সালে হক সাহেব আর শহীদ সাহেব গোপালগঞ্জ এসে আমার জীবনটা পুরোপুরি বদলে দিলেন। কী জাদুতে যে শহীদ সাহেব আমাকে জড়ালেন, তা ভাবলে আজও লোকটার প্রতি শ্রদ্ধা আর ভালোবাসায় মাথা নত হয়ে আসে। সেই শুরু আমার পূর্ণকালীন রাজনীতির জীবন। এখন আমাকে দিনে আঠারো ঘণ্টা খাটতে

হয়। ভবিষ্যতে কাজের চাপ আরও বাড়বে। তারপরও বলব, পরাধীন দেশকে শত্রু মুক্ত করার জন্য আমার এ পরিশ্রম মোটেও যথেষ্ট নয়। এখন অসুস্থ্য হওয়ার জন্যও কোনও সময় আমার হাতে নেই। শুধু একটা কথা জানি, দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে আমি আমার শরীরকে বিশ্রাম দিতে পারব না।

তা হলে রেণুর জন্য সময় কোথায় পাব? আজকে আমার আর রেণুর যে সম্পর্ক, আগামী কাল তাতে নতুন মাত্রা যোগ হবে। আমি রেণুর দিকে চাই। ওর চোখে ভারের আধিপত্য বেড়েই চলেছে।

রেণুকে এ অবস্থায় দেখতে আমি অভ্যস্ত নই। কষ্টে আমার বুক ভেঙ্গে যেতে চায়। রেণু কেন তা দেখে না? আমি রেণুর দিকে চাই। চির-চেনা রেণুর খোঁজে। কোথায় সে?

"ইংরেজরা যাবে, মজিবর," এক দিন হামিদ মাস্টার বলেন। "তাদের জায়গায় দেশি শোষকরা স্থান করে নিবে। যদি মানুষের জন্য কাজ করতে চাও, কখনও রাজনীতি ছেড়ো না।"

কথা ছিল হামিদ মাস্টার আমাকে পড়াবেন স্কুলের বই, যা উনি কোনও দিন খুললেন না। আর আমি খুললেও তিনি তা বন্ধ করে দিতেন। মূলত তাঁর প্রভাবে পাঠ্য বই না পড়ে স্কুলের পরীক্ষায় বসা আমার অভ্যাস হয়ে যায়। তারপরও মেট্রিকের জন্য আমি ভালো প্রস্তুতিই নিয়েছিলাম। পরীক্ষার আগের দিন জ্বর আসে। মামস হয়ে গলা আর ডান ঘাড় ফুলে যায়। জ্বর যখন ১০৪ ডিগ্রি ওঠে তখন আব্বা বলেন, পরীক্ষা দেয়ার দরকার নেই। আব্বা প্রতি ঘন্টায় এক জন করে নতুন ডাক্তার নিয়ে আসেন। সন্ধ্যা নাগাদ গোপালগঞ্জের সব ডাক্তার আমার দেখা হয়ে যায়। রেণু আমার অনেক সেবা করে। আব্বা সারা রাত আমার মাথার কাছে বসে থাকেন। রেণু আর আম্মাও। সকালে আমি আব্বাকে বলি, আব্বা আমি পরীক্ষা দিব। আমি পরীক্ষা দিতে উদ্‌গ্রীব ছিলাম, কারণ আমার ইতিমধ্যে চার বছর নষ্ট হয়ে গেছে। আব্বা আমাকে পরীক্ষার হলে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজে বাইরে বসে থাকেন। আমার জন্য বিছানার ব্যবস্থা করা হল। বাংলার প্রথম পত্রের পরীক্ষা যখন চলে, তখন অর্ধেক সময় আমাকে শুয়ে থাকতে হয়। কিছুতেই মাথা তুলতে পারি না। তারপরও দশ মিনিটি পর পর উঠে জ্বরের ঘোরে কয়েক মিনিট করে লিখি। বিকালের দিকে জ্বর একটু পড়ে। দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা বসেই দিই। ফলাফল: আমি দ্বিতীয় শ্রেণিতে মেট্রিক পাশ করলাম। জ্বর না হলে কী রেজাল্ট হত, বলা মুশকিল ছিল।

মেট্রিক পরীক্ষার রেজাল্ট নিয়ে আমার কোনও অনুশোচনা নেই। আমি জীবনে যা করতে চাই, তা কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও সার্টিফিকেট

আমাকে এনে দিতে পারবে না। তাই বলে সার্টিফিকেটের গুরুত্ব নেই, সে কথাও আমি বলি না। প্রত্যেকের জীবনের কাজ আলাদা। যাঁদের সার্টিফিকেট দরকার, তাঁরা সেটাকে ভালো করার জন্য পাঠ্যবই মুখস্থ করবেন, সেটাই নিয়ম। তাঁদের সাথে আমার কোনও বিরোধ নেই।

হামিদ সাহেবের জীবনের একমাত্র অনুরাগ ছিল রাজনীতি। তিনি আমাকে তার পাঠ দিতে থাকেন। মতবাদের দিক থেকে তিনি ছিলেন চরমপন্থী। তবে তিনি বলতেন, চরমপন্থা শুধু তাঁরাই অবলম্বন করে সফল হন, যাঁরা নিজের চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন আর তা উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাজে নিয়োজিত করতে পারেন।

হামিদ স্যার আমাকে আত্মনিয়ন্ত্রণের সূত্র খুঁজে পেতে সাহায্য করেন। আমি বুঝতে পারি, যে কোনও প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ভাবনা মনকে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিয়ে দেয়। আর লাগামহীন চিন্তা আমার সাথে যুদ্ধ করে। ক্রমে আমি মনের অস্ত্র নির্বিষ করার মন্ত্র শিখি। সে মন্ত্র হলো বর্তমানকে নিয়ে ব্যাপৃত থাকা। এর প্রকাশ যত সহজ, বাস্তবায়ন তত কঠিন ছিল। সেই কঠিনকে আমি আয়ত্ত করেছি। ঝড়ে উড়ে গিয়ে মান্দার গাছের ছালে আছড়ে পড়া, জলোচ্ছ্বাসে ডুবে গিয়ে কুমিরের খাদ্য হওয়া, করাতের ঘায়ে ঠ্যাঙ হারানো, বজ্রের আঘাতে চিত হয়ে পড়া, ইত্যাদি যাবতীয় দুর্ঘটনা জীবনে ঘটবে, এটাই স্বাভাবিক, তাই এ সব অপঘাতকে গ্রহণ করে নিতে হয়। আমি তা গ্রহণ করেছি। গ্রহণ আমার জীবনকে সহজ করে। আজ যখন আমার বাইশ বছর বয়স, যখন আমার জীবনে দেখা সবচেয়ে সুন্দরী কিশোরীর সাথে আমার বাসরের প্রস্তুতি চলছে, তখন আমি পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখি, কীভাবে, ধীরে ধীরে, অনুশীলন করে, আমি সংযমের রাস্তা বেয়ে এত দূর এলাম। এখন আমি, আমার শরীর, আমার মন, এই তিন মিলে এক সত্তা। খ্রিস্টীয় ত্রিত্ব-বাদ আমি ভালো বুঝি না, তবে আমার নিজস্ব ত্রিত্ব-বাদ আমাকে শক্তি দেয়। এ শক্তি সব কিছু জয় করতে পারে, সকল অসুখ নিরাময় করতে পারে। তবে সর্দি-জ্বর, দাঁতের ব্যথা, চোখ ওঠা এসব ঠিক অসুখের মধ্যে পড়ে না। তাই এদের আমি মেনে নিয়েছি। কিছু দিন গানবাজনা, নৃত্য আর ব্রতচার পালন করে আনন্দ পেয়েছি। তবে চূড়ান্ত বিচারে দেখেছি, ওই পথ আমার নয়। তখন আমি পির-ফকির-সাধু-সন্ন্যাসি হওয়ার বাসনা ত্যাগ করেছি। ছোটবেলায় টুঙ্গিপাড়ার বাড়িতে আমরা ভাইবোন সবাই মৌলবি সাহেবের কাছে কোরান শরিফ পড়তাম। তাঁর কাছ থেকে ধর্মীয় বিধি-বিধান শিখেছি। তারপর পণ্ডিত সাখাওয়াতুল্লাহর কাছে পড়েছি। আরও কয়েকজন গৃহশিক্ষক

আমাকে পাঠ দিয়েছেন। কিন্তু হামিদ স্যারের মতো কেউ আমাকে প্রভাবিত করতে পারেননি।

হামিদ স্যারের জন্য আব্বা আমাদের গোপালগঞ্জের বাড়িতে একটা আলাদা রুম করে দেন। সে কক্ষে দরিদ্র অসহায় ছাত্রদের আনাগোনা ছিল। মাস্টার সাহেব আর আমি আমাদের দাতব্য কাজের পরিধি বৃদ্ধি করি। মুষ্টি ভিক্ষা করতে গেলে অনেকের সাথে ঠোকাঠুকি হতো। হামিদ স্যার আমাকে না পড়ালেও অন্য গরিব ছাত্রদের তিনি বিনা পয়সায় পড়াতেন। আমরা অনেকের জায়গিরের ব্যবস্থা করে দিতাম।

ছোটবেলা থেকেই নিজেকে ব্যস্ত রাখা আমার অভ্যাস। আর হামিদ স্যারের প্রভাবে আমি সচেতনভাবে কাজকে ভালোবাসা শুরু করি। পরিবারের দিকে তাকিয়ে আমি স্বদেশী আন্দোলনের বিপ্লবী হওয়া থেকে বিরত থাকি। কিন্তু আন্দোলন চালিয়ে যাই আর স্থানীয় সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য মাঝে মাঝে গায়ের জোর প্রয়োগ করি। এর মধ্যে আমার একটা ছোট-খাটো দলও তৈরী হয়। সবাই হামিদ স্যারের শিষ্য। কিশোর দল। আমাদের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে আমরা সবাই তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতাম। হামিদ স্যার বলতেন, "মজিবর, গরিবের রক্তচোষা এসব ভূমিদস্যু জলদস্যু আর পৃথিবীতে স্থায়ী দুঃখ রচনাকারী সাম্প্রদায়িক কীটগুলোকে মেরে ফেলা দরকার। তার জন্য তোমাকে দেশ স্বাধীন করতে হবে, দেশের ক্ষমতায় বসতে হবে। যতদিন তা না পারো, ততদিন খেয়াল রেখো, কেউ যেন তোমাদের আঘাতে মরে না যায়।"

আমরা স্যারের অনুগত বালক-দল। সমাজকে কলুষিত করে এমন লোকগুলোকে আমরা সাজা দিতে থাকি। আমাদের দেখে তারা চুপ হয়ে যেত। কথা আস্তে বলত। অনেক সময় রাস্তা থেকে সরে যেত। আমরা চলে গেলে আবার তারা রাস্তায় এসে গণ্ডগোল করত। কখনও কখনও ওরাও রুখে দাঁড়াত। আমরা কয়েক বার বিপদে পড়েছি, আবার কী করে যেন তা থেকে উদ্ধারও পেয়েছি। মাঝে মাঝে আব্বা আমাকে শাস্তি দিতেন।

একদিন আব্বা অফিস থেকে একটা ভাঙ্গা ইট হাতে করে বাসায় আসেন। আব্বাকে দেখে আমার শরীর শক্ত হয়ে যায়। "ইট কেন?" আম্মা বলেন। আব্বা হাতের ব্যাগটা আম্মাকে দেন কিন্তু ইটটা হাতে রাখেন।

"খোকা, এটা চিনতে পেরেছ?"

আমার বুক মোচড় দেয়। অনেক মুসলমান সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আমাদেরকে মুষ্টি ভিক্ষা দিতে চান না। পূর্ববর্তী দিন বিকালে ভিক্ষা সংগ্রহ করতে গেলে আমাদের অতি পরিচিত আকবর আলী আমাদের পথ রুখে দাঁড়ান। আকবর আলীর কথা হলো আমরা যে-ভাবে গরিব ছেলেদের স্কুলে নিয়ে যাচ্ছি, তাতে ভবিষ্যতে আর গোপালগঞ্জে চাকর-বাকর, মাঠের শ্রমিক, দোকানের কর্মচারি পাওয়া যাবে না। তখন আকবর আলীর মতো প্রতিষ্ঠিত পাট ব্যবসায়ীকে তাঁর নিজের নৌকা নিজেকেই ঠেলতে হবে। আমাদের এক ছেলে তাঁকে রক্তচোষা বলে গালি দেয়। দীর্ঘদেহী আকবর আলী ছেলেটার গালে এমন একটা চড় মারেন যার আওয়াজ আমরা সকলে শুনলাম। ছেলেটা আঘাত না নিতে পেরে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ে। আকবর আলী আমাদের গালি দিতে থাকেন। "চান্দা তুলে গাঁজা আর তাড়ি খাওয়া। শেখের দশ হাত লম্বা ছেলে, খাল পাড়ে যায়।"

খাল পাড়ের কথিত বাড়িটা গোপালগঞ্জে খুব পরিচিত। জনা বিশেক নারী সেখানে বাস করেন। আকবর আলীর কথা শুনে লজ্জায় আমার গাল পুড়তে থাকে। আমি আকবর আলীর দিকে তেড়ে যাই। দুটো ছেলে আমাকে টেনে ধরে, আর হামিদ স্যারের মন্ত্র স্মরণ করিয়ে দেয়। আমি অপমান হজম করি।

"আর কখনও যদি তোদের আমার বাড়িতে দেখি, আমি তোদের পুলিশে

দিব,” আকবর আলী চেঁচিয়ে বলেন। এর মধ্যে ওনার দুই কর্মচারি কাচারি ঘর থেকে বের হয়ে আসেন। তাদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে লম্বা কিরিচ।

ধারালো অস্ত্র দেখে আমরা পিছু হটি। আকবর আলীর বাড়ির দিকে আমাদের চোখ। উনি ইটের নতুন ঘর বানিয়েছেন, উপরে টিনের ছাদ।

রাতে আমরা পাঁচটা ছেলে দশটা ইটের টুকরা নিয়ে গিয়ে আকবর আলীর বাড়ির সীমানায় ঢুকি। প্রত্যেকে টিনের চালে এক টুকরা ইট মারি। ওই সময় ঘরের ভিতরে আকবর আলীর মেয়েরা ও-আব্বারে ও-আব্বারে বলে চিৎকার শুরু করে। কয়েকটা শিশু কেঁদে ওঠে। সকলের বিলাপ শুনে আমার খারাপ লাগে। আমি আমার ছেলেদের ইশারায় থামাই। যে পাঁচটা ইট ব্যবহৃত হয়নি, সেগুলো নিয়ে আমরা ফিরে আসি।

আব্বার চোখে সব সময় একটা তেজ থাকে। এখন তা জ্বলছে। আব্বার হাতে যে লাল ইটের টুকরাটা রয়েছে, কোনা ভাঙ্গা, সেই ইটটা আমি নিজে আকবর আলীর টিনের চালে ছুঁড়ে মেরেছিলাম।

“আকবর আলি আমাকে ইটটা দিয়ে গেল। আর তিনশ টাকা নিয়ে গেল ওর চালের ক্ষতিপূরণ বাবদ,” আব্বা বলেন।

আব্বার কণ্ঠে হতাশা। আমি মেরুদণ্ডে শীতলতা অনুভব করি। আব্বা ইটের টুকরাটা আমার মাথায় চেপে ধরেন। আম্মা দেখছিলেন। রেণু দেখছিল। আমার ভাইবোনরা দেখছিল। হাবু শেখ দেখছিলেন। আমি দাঁতমুখ চেপে রাখি, তবু চোখের পানি বের হয়ে যায়। আব্বা ইটটা ছুঁড়ে ফেলে দেন। তারপর আমার চুল মুঠিতে নিয়ে আমার বাম গালে সজোরে থাপ্পড় মারেন।

আব্বার হাতের আঙ্গুল যে এত শক্ত আমার জানা ছিল না। তারপর তিনি আমাকে আর একটা থাপ্পড় মারেন। আমার আম্মা নীরব। আব্বা আমাকে আরও দুই একবার শাস্তি দিয়েছিলেন। তখন গায়ে অপমানের কাঁটা বিঁধেনি। বুঝলাম আমার মনের মধ্যে অহংকার দানা বেঁধেছে। আমি ছেলেদের একটা দল চালাই। বাইরের লোকজন আমাকে সমীহ করেন। আর ঘরের ভিতর আব্বা আমাকে মেরে চলেছেন। সে দিন আমি আমার আম্মার চরিত্রটা আর একটু ভালো করে বুঝলাম। আম্মা আমাকে আব্বার শাস্তি থেকে বাঁচাতে এলেন না। আরক্তিম গাল নিয়ে ভীরু চোখে রেণু আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

এ সময় প্রায় দৌড়ে এসে আব্বার বন্ধু আব্দুল হাকিম মিয়া ঘরে ঢুকে

আব্বার হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করেন।

“মজিবর, বাবা, তুমি ভিতরে যাও,” আব্দুল হাকিম মিয়া বলেন।

আব্দুল হাকিম মিয়ার ব্যবহারে আমার গলা ধরে আসে। আব্বা ছাড়া আর এক জন ব্যক্তি, এই আব্দুল হাকিম মিয়া, সব সময় আমার কাজকর্মের উপর চোখ রাখতেন। তাঁর চোখকে ফাঁকি দিয়ে দিনের বেলা কিছু করা সম্ভব ছিল না। আমার জীবনে যত বকা খেয়েছি তার বেশিরভাগ এই হাকিম মিয়ার কাছ থেকে। মাঝে মাঝে আমার এমনও মনে হতো, লোকটা মরে না কেন।

“ছেলেকে মেরে লাভ হবে না, শেখ সাব,” হাকিম চাচা বলেন। আমি ভেতরের দরজার কাছে এসে তাঁর গলা শুনি।

“আকবর আলীর মতো একটা লোকের কাছে আমাকে অপমানিত হতে হবে?” আব্বা বলেন।

“দুই দিন আগে হলেও আমি বলতাম, তুমি মজিবরকে আরও বেশি করে শাস্তি দাও। কিন্তু আজকে বলতে পারছি না, শেখ।”

আমি ফিরে দেখি আব্বা চোখ বড় করে হাকিম চাচার দিকে তাকান। আব্বা কিছু বুঝতে পারছিলেন না। অবশ্য আমিও কিছু বুঝতে পারছিলাম না।

“তুমি নিশ্চয়ই ক্ষুধার্ত,” হাকিম চাচা বলেন, “আমিও। ভাবি সাহেবাকে বলো ভাত দিতে। খাওয়া-দাওয়া করে আমরা মজিবর থেকে আসল ঘটনা শুনব।”

এর পর তাঁদের মধ্যে কী কথা হয়, তা আর আমি শুনিনি। আমি ভেতরের ঘরে প্রবেশ করি। আর থমকে দাঁড়াই।

ঘরটাতে ঢুকে আমি ভালো করিনি। যা দেখি তাতে আমার ভেতরটা জমে যায়। কয়েক মুহূর্ত বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। তারপর ভাবি: চলে যাই। কিন্তু যেতে পারি না। আমার পা দুটি থেমে থাকে। আমার থেকে কয়েক হাত দূরে খাটের উপর আম্মার কোলে মাথা লুকিয়ে রেণু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। আর ওর ছোট দেহটা অশান্ত ঢেউয়ের মতো তরঙ্গায়িত হয়।

ওটা ছিল আমার জীবনে দেখা অন্যতম করুণ দৃশ, যা আজও ভুলিনি।

সেই দিন রেণু শিশুর আচরণ করেনি। আব্বার মারের অপমান ভুলে আমি ভাবতে থাকি কী করব আমি এ রেণুকে নিয়ে? আম্মা আমাকে দেখেছেন কিন্তু আমার উপস্থিতি স্বীকার করছেন না। দুই নারীর প্রতিই আমার মনে ক্ষণিকের জন্য বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হয়। তখন আমি দেশের কাজে এতটাই নেমে পড়েছিলাম যে, আমি ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছিলাম। কীভাবে রেণু আমার

কাজের পথে কাঁটা হয়ে বিছিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু রেণুকে উপেক্ষা করার শক্তি আমি অনেক আগেই হারিয়ে ফেলেছিলাম। যে দিন রেণু চশমা খুলে দেখল আমার চোখ ভালো হয়ে গেছে, সে দিন তার যে আচরণ, তা আমাকে চির দিনের জন্য কিনে নিয়েছে। আর এখন হতাশার গহ্বরে পড়ে গিয়ে আমি উন্মুক্ত নিঃশ্বাসের অভাব বোধ করছিলাম।

আমাদের গোপালগঞ্জের বাড়িতে কয় দিন আগে টেবিল চেয়ার কেনা হয়েছিল। মাদুরের উপর বসে আমাদের খানা খাওয়ার দিনও তখন শেষ হয়। আব্বা অসময়ে বাড়ি এসেছেন। হাবু শেখ ডিম ভাজি করেছেন। আম্মা দ্রুত ডাল আর সবজি রান্না করলেন। পাকা কলা, দুধ আর ফিরনিও পরিবেশন করা হলো। আব্বা আর তাঁর বন্ধু ক্ষুধার্ত। তাঁরা দ্রুত আহার করেন।

"তোমার ছেলেকেতো আমি কম বকাবাজি করি নাই, শেখ সাব," হাকিম চাচা দুধ আর কলা দিয়ে ভাত মাখেন আর বলেন। "কিন্তু কোনও দিনতো ও আমার সাথে বেয়াদবি করে নাই।"

"ও একটার পর একটা কাণ্ড করে চলেছে, আমি সহ্য করি," আব্বা বলেন। "তা-ই বলে এমন কাণ্ড।"

"বাবা মজিবর, বলতো কী হয়েছিল?" হাকিম চাচা বলেন।

হাকিম চাচার মুখে ঘন কালো দাঁড়ি। মাথায় কিস্তি টুপি। ছোট-খাটো মানুষ। কিন্তু গলার স্বর স্কুল-দপ্তরীর ঘন্টির মতো পরিষ্কার। আমি পূর্বের দিনের ঘটনা খুলে বলি। খাল পাড়ের বাড়িটার কথা বলার সময় আবদুল হাকিম মিয়া হো হো করে হেসে ওঠেন। হাসলে হাকিম চাচার মুখ কতটা নিষ্কলুষ তা বোঝা যায়। ডান দিকের উপরের পাটিতে একটা সোনার দাঁত। ওনার হাসি বুঝি থামবে না।

আব্বার মুখ লাল। উনি হাকিম চাচাকে কটাক্ষ করেন। হাকিম চাচার হাসি সপ্তমে চড়ে। "শেখ সাব," বিষম খেয়ে হাকিম চাচা বলেন। "দুই দিন আগে আমি আকবর আলীকে ওই বাড়ি থেকে বের হতে দেখেছি।" এ কথা বলে তিনি আবার হো হো করে হাসতে থাকেন।

"আমার ছেলে কেন তার সাথে লাগতে গেল?" আব্বা বলেন।

আম্মা মাথায় ঘোমটা দিয়ে এক বাটি পোড়া লাল আলু নিয়ে আসেন। "আপনাদের ভালো করে খাওয়া হয় নাই," আম্মা বলেন। "আমি বড় লজ্জিত।"

আমি দেখি রেণুর চোখের জলে আম্মার শাড়ির আঁচল ভিজে আছে। রেণু চুলার কাছে একটা জলচৌকিতে বসে আছে, আমাদের দিকে পিঠ ঘুরিয়ে।

আমার ভাইবোনরা অন্য ঘরে পালিয়ে আছে। ওরা সবাই আমাকে সম্মান করে, ভালোবাসে। আমার অপমান ওদেরও নিশ্চয়ই বুকে লেগেছে।

হাকিম চাচা একটা আলুর টুকরা টেনে নিয়ে ওটাতে ফুঁ দিয়ে ঠান্ডা করেন, পরিচ্ছন্ন নখ দিয়ে চামড়া ছাড়িয়ে তা বাটির এক পাশে রাখেন, আর তপ্ত লোহার আভাযুক্ত সুমিষ্ট আলুর এক কামড় মুখে পুরে তৃপ্তিসহকারে খেতে থাকেন। সহজ-সরল ভদ্রলোক, কিন্তু চেতনায় কঠিন। আব্বার অন্তরঙ্গ বন্ধু বলে আমার অভিভাকত্ব নিজে যেচে নিয়েছেন। লোকটার মৃত্যু কামনা করতাম বলে আমার মনে অনুতাপ হয়। সে দিন হাকিম চাচা পরিবেশটাকে স্বাভাবিক করে বিদায় নেন।

কিন্তু আমার মনের পরিবেশ স্বাভাবিক হয় না। আমার চোখের উপর রেণুর কান্নার দৃশ্যটা বার বার ভেসে আসে। আর হামিদ মাস্টারের জন্যও আমার দুশ্চিন্তা হয়। আমার মনে হচ্ছিল এবার আব্বা হামিদ মাস্টারকে কান ধরে বাড়ি থেকে বের করে দিবেন। আমি কীভাবে তা ঠেকাব, সেই চিন্তা করছিলাম। আব্বার পায়ে পড়ে হামিদ মাস্টারের ইজ্জত ভিক্ষা করার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু আমার আব্বা হামিদ মাস্টারকে কিছুই বললেন না।

পরের দিন আমি মাস্টার সাহেবকে আব্বার সহিংস আচরণ সম্পর্কে অবগত করি। মাস্টার সাহেবের মুখের ভাবের কোনও পরিবর্তন হয় না। তাঁর শেভ করা থুতনির ডান দিকে ঠোঁটের কাছাকাছি একটা তিল, যার উপর এক বিন্দু রক্ত জমে রয়েছে। স্যারের ক্লেশপূর্ণ জীবন। তাঁর একটা নতুন ক্ষুর দরকার। দেখি কয়েক দিন পর, সব কিছু ঠিক থাকলে, আমি সিদ্ধান্ত নিই, আব্বাকে বলব স্যারকে একটা ক্ষুর কিনে দিতে। আমি স্যারকে খালপাড়ের বাড়িটির কথা বলি। তাতেও তাঁর কোনও আগ্রহ নাই।

"শুন মজিবর," তিনি বলেন। "এ ব্যাপারে আমার ভিন্ন মত এবং ব্যাখা রয়েছে, যা তোমাদের বুর্জোয়া সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই আমি তার ব্যাখ্যা তোমাকে দেব না। বরং তোমাকে রুশ বিপ্লবের গল্প শুনাই।"

আমি রুশ বিপ্লবের গল্প অনেক শুনেছি। ভ্লাদিমির লেনিন কর্তৃক কৃষককে জমি আর শ্রমিককে রুটি দেয়ার সিদ্ধান্ত যেমন আমাকে অনুপ্রাণিত করে তেমনি গুপ্ত বাহিনী চেকার-এর কঠোরতা আমার মর্মে আঘাত হানে। হামিদ মাস্টারের কথা হলো:

"যারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করে না, তাদের মেরে ফেলা ছাড়া কোনও উপায় নাই।"

স্যারের কথা শুনে আমার গায়ে কাঁটা দেয়। তারপরও তাঁকে অপছন্দ করতে আমি অক্ষম। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর উচ্ছ্বাস এত বেশি যে পারলে তিনি একাই ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্র কায়েম করে বসেন। কিন্তু তিনি তাঁর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই আমাদের কয়েকটি ছেলেকে নিয়ে দাতব্যের কাজ করে তিনি মনে কিছু শান্তি পেতেন। আমি আব্বার হাতে অপমানিত হয়েছি, এটা মাস্টার সাহেবের কাছে কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়।

"পিতার ঘুসি, শত্রুর ছুরি, পুলিশের ডান্ডা, জেলের ভাত এসব তোমার দেশপ্রেমের পরিচয়," তিনি বলেন।

হামিদ স্যারের কথা হলো, জীবন ছোট, তাই কোনও কিছু ফেলে রাখতে নেই। অনেক বার ইংরেজ শাসক তাঁকে জেলে নিয়েছেন। শেষে যক্ষ্মা রোগে অকালে মারা গিয়ে তিনি প্রমাণ করলেন, জীবন ছোট। স্যারের মৃত্যুর পরও তাঁর স্মরণে আমি মুষ্টিভিক্ষার কাজটা বেশ কিছু দিন চালিয়ে যাই।

এরপর আব্বা আর কখনও আমার গায়ে হাত তোলেননি। আমাকে ব্যারিস্টার বানানোর জন্য ওনার মনে যে বাসনা ছিল, তা-ও দিন দিন কমতে থাকে। উনি বুঝতে শুরু করেন, আমি যা চাই তা কোনও ব্যরিস্টারের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। ফলে আব্বা আমাকে মেনে নিয়েছেন। উনি বুঝেছেন, আমি বিপ্লবী না হলেও আমি একজন মুক্তি-যোদ্ধা, একজন স্বাধীনতা-সংগ্রামী।

ভারতবর্ষের মুক্তি-সংগ্রামের কাজ আমি অদ্যাবধি চালিয়ে এসেছি। গতকালও দশ মাইল হেঁটেছি। পরাধীনতার গোলামি রাজা-রানিদের অসুখী দাম্পত্যের মতো আমাদের লোহার শিকলে বেঁধে রেখেছে। কত রাজা-রানি এই অসুখ ভোগ করতে করতে মরে গেছেন তার হিসাব নেই। আমি যখন আমাদের মানুষদের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখাই, ভাত আর কাপড়ের স্বপ্ন দেখাই, পিঠা-পায়েশ, আম-জাম-কাঁঠালের স্বপ্ন দেখাই, রুই মাছের স্বপ্ন দেখাই, মুরগির ঝোলের স্বপ্ন দেখাই, ওদের চোখ চকচক করে। ওদের যত দেখি তত আমার কর্মস্পৃহা বাড়ে, শরীর হালকা হয়। আমি সৌভাগ্যবান। আমার আব্বা আম্মা কেউ আর এখন আমার কাজে বাধা দেন না। আমি যে বেঁচে আছি, সুস্থ্য আছি, এতেই তাঁরা খুশি। তাঁদের এখন একটাই বাসনা, রেণুকে নিয়ে আমার যেন একটা সুখের সংসার হয়। আমিও সেই আশা লালন করি। আমি জানি রেণুর উপর আমার বাকি জীবন নির্ভর করছে।

পিতামহ জীবিত থাকতে পিতা মারা গেলে আমাদের মুসলিম আইন অনুযায়ী সে পিতার সন্তানরা সম্পত্তির উত্তরাধিকার পায় না। রেণুর পিতার মৃত্যুর পর ওর দাদা যাতে তাঁর নাতনিরা তাঁর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত না হয়, সে ব্যবস্থা করেন। তিনি তাঁর সম্পত্তি দুই ভাগ করে দুই নাতনির নামে লিখে দেন আর তাদের স্বামীদের পক্ষের মুরুব্বিদের সম্পত্তি দেখাশোনার ভার দেন। রেণুর সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার পড়ে আমার আব্বার উপর।

রেণুর বয়স যখন সাত, তখন একদিন রেণুর দাদা, শেখ কাশেম, উঠানে পড়ে যান। তিনি আর উঠতে পারেননি। তাঁর জবানও বন্ধ হয়ে যায়। যাঁরা আমার বেরিবেরি রোগে গোপালগঞ্জের চিকিৎসক ডাক্তার নলিনী বাবুকে স্মরণ করতে পারলেন, তাঁদের সবার একটাই কথা, রেণুর দাদার হার্টে ছিদ্র আছে। কিন্তু তিনি সহসা মৃত্যু বরণ না করাতে তাঁদের মনে সন্দেহ জাগে। আব্বাকে খবর পাঠানো হয়। আমি আর আব্বা গোপালগঞ্জ থেকে নলিনী ডাক্তারকে নিয়ে বাড়ি আসি।

তিন বছর আগে নলিনী ডাক্তারকে যখন প্রথম দেখি, তখন ওনার স্বাস্থ্য ছিল একটা তেজী ঘোড়ার মতো। এই তিন বছরে ওনার ওজন বুঝি অর্ধেক কমে গেছে। মুখের উপর ও নিচের পাটিতে বেশ কয়েকটা দাঁত নাই। তিন বছর আগে তাঁর মাথায় ছিল কাঁচা-পাকা ঘন চুল, এখন তাঁর মাথার তুলিতে একটা কালো প্লাস্টিকের বাটির পিঠের মতো বড় টাক। উনি বললেন ওনার বহুমূত্র রোগ হয়েছে এবং উনি পৃথিবীতে আর বেশি দিন থাকবেন না।

শেখ কাশেমকে পরীক্ষা করে ডাক্তার বাবু বললেন এটাও হার্টের ব্যারাম, তবে হার্টে কোনও ছিদ্র নাই। পক্ষাঘাতে রেণুর দাদা অচল হয়ে গেছেন। তিনি সর্বোচ্চ বিশ বছর পর্যন্ত বিছানায় গড়াতে পারেন।

"বিইইশ বছর," কেউ একজন বলে ওঠেন।

পতনের পর রেণুর দাদার পেট খারাপ হয়। ডাক্তার বাবু তাঁর পেট শক্ত করার জন্য পাঁচ রকমের সিরাপ দেন।

আমার আম্মা আর বড় বোন ফাতেমা বেগম রেণুর দাদার সেবা করেন। চার দিন পর রেণুর দাদা মারা যান।

রেণুর আম্মার মৃত্যুর পর আমি দ্বিতীয় মৃত্যু দেখি আমার চোখের সামনে। ওই চার দিন রেণুর দাদা শেখ কাশেমের চোখ দু'টি খুব চঞ্চল ছিল আর ওনার শরীরের ডান অংশ নিরন্তর কাঁপছিল, যদিও শরীরের বাম অংশ ছিল সম্পূর্ণ নিশ্চল। পড়ে যাওয়ার চতুর্থ দিন বেলা দুটার কিছু পর তাঁর চোখ দুটি শান্ত হয় আর শরীরের ডান অংশের কাঁপনও পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। তখন আমরা সবাই বুঝতে পারি শেখ কাশেম পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে উঠেছেন। তিনি বিছানায় উত্তর দিকে মাথা রেখে শুয়ে ছিলেন। মিনিট বিশেক পর শেখ কাশেমের মুখটা কেবলার দিকে কাত হয় আর মুখের উপর একটা নুরানি আভা ভেসে ওঠে। আমরা সবাই তা দেখি। শেখ কাশেমের মাথার কাছে চালের মধ্যে রোপিত এক গুচ্ছ আগরবাতি জ্বলছিল। তাঁর মুখের আভায় তখন আগরবাতির ধোঁয়ার একটা অংশে যেন চাঁদের আলো পড়ে। রেণু ওর মুক্ত হাত দিয়ে আমি যে হাতে ওকে ধরে রেখেছি সে হাতে চাপ দেয়। আমি রেণুর দিকে চাই। বুঝলাম রেণুও ওর দাদার শেষ সময়ের প্রতিটা মুহূর্তের উপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে। একজন মানুষ পৃথিবী থেকে চলে যাচ্ছেন, আমরা সবাই বুঝতে পারছিলাম। অনেক ফোঁপানি, কান্না, দীর্ঘশ্বাস শুনছিলাম। দোয়া-দরুদ শুনছিলাম। কিন্তু আমি দেখছিলাম রেণুর দাদাকে। "ভালো করে দেখো," আমি মাথা নামিয়ে অস্ফুটে রেণুকে বলি। রেণু তখন আমার হাত আরও শক্ত করে ধরে।

রেণুর দাদার শান্ত আর অবিচল মুখটার উপর সোনালী আভা, সেই আভায় তাঁর সাদা চাপ দাড়ি উজ্জ্বল। আমরা সবাই অপলকে তাঁর দিকে চেয়ে থাকি। আমি আরও একটা জিনিস খেয়াল করি। আমার জন্মের পর থেকে রেণুর দাদার কপালে পাঁচটা বলিরেখা দেখে এসেছি। সে বলিরেখাগুলো মিলিয়ে গিয়ে তাঁর মুখখানা শিশুর মুখের মতো মসৃণ হয়ে গেল। আমার এক দূর-সম্পর্কের ফুফা, যিনি একজন পীর, শেখ কাশেমের শিয়রের পাশে বসে সারাক্ষণ কালিমা তাইয়্যেবা পড়ছিলেন। এ সময় তিনি কালিমা পড়া বন্ধ করেন। বলেন, "চাচাজানের উপর আল্লাহর রহমতের নুর। ওনার কবর আজাব মাফ হয়ে গেছে। উনি বেহেশতবাসি হবেন।"

তখন আমরা সবাই বুঝতে পারি শেখ কাশেম ইতোমধ্যে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন।

রেণুর দাদার এমন মৃত্যু আমার মনে একটা স্থায়ী দাগ কাটে। আমার মনে হলো, মৃত্যুর পূর্বেই রেণুর দাদা অনন্ত সুখের রাস্তায় উঠে গেলেন। রেণুর আম্মাকেও তাঁর মৃত্যুর ঠিক আগে এমন একটা শান্তির মধ্যে প্রবেশ করতে দেখেছিলাম। আমার মনে তখন প্রশ্ন, এটাই কি মৃত্যুর রূপ? সকলের মৃত্যুই কি এভাবে হয়? না শুধু শেখরা এভাবে মরে? চিন্তাটা আমার কৌতূহল বাড়িয়ে দেয়। আর আমার মনে হয়, রেণুর আব্বার মৃত্যুটা দেখতে পেলে খুব ভালো হতো।

মৃত্যুর এমন দৃশ্য রেণুকে দেখিয়ে রাখতে পেরে আমি শান্তি অনুভব করি। শেখ কাশেমকে যখন কবর দিতে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন আমি যাই না। আমি রেণুর সাথে থেকে যাই। রেণু আমার দিকে চায়। আমি ওর চোখ দেখি। রেণু কাঁদে না, কিন্তু ওর চোখ দুটি লাল।

তারপর গত পাঁচ বছর রেণুর চোখ দেখে এসেছি। দেখেছি ওর চোখের গভীরতা, ভার আর দ্যুতি। দেখেছি কী ভাবে ভার দ্যুতিকে আগুন হওয়া থেকে নিবৃত্ত করে আর নরম একটা আলোর স্রোত করে ছেড়ে দেয়। তারপর রেণুর ভেতর ছন্দ আর শক্তি আবিষ্কার করি। আর তাতে আমি নিজের ভেতর এমন এক সুখ পাই, যা আমাকে মন-প্রাণ উজাড় করে বাইরের দিকে তাকাতে সাহায্য করে। আর রেণুর চোখের ভার আমাকে দেয় ভারসাম্য।

আজ যার ছন্দপতন হয়েছে বলে মনে হয়। আজ রেণুর চোখের ভারে চড়ে বসেছে এক অসহনীয় ওজন, যা শুষে নিয়েছে সব আলো। কীভাবে রেণুর ছোট্ট শরীরটা এমন ভারী দুটি চোখ ধারন করে আছে, আমি তা বোঝার চেষ্টা করি। মনে হয় এই ভার আর আমার জীবনের নোঙর নয়। এই ভার আমার মাথার উপর দুটি দুঃসহ শিলাখণ্ড।

আমাদের বাসর এর প্রস্তুতির জন্য সময় কম ছিল। শুধু আমার ব্যস্ততার জন্যই নয়। এর জন্য অন্য একটা কারণও ছিল। আমি মেট্রিক পাস করেছি, তাও আবার চার বছর বেশি বয়সে। এখন কোলকাতায় যাব কলেজে ভর্তি হতে। সুতরাং তার আগে এই শুভ কাজটি করার জন্য আম্মা তাগাদা দিতে থাকেন। যেহেতু আমাদের শৈশবেই বিয়ের রেজিস্ট্রি হয়ে যায়, তাই বাসরের অনুষ্ঠানটাকেই মুরুব্বিরা আসল বিয়ে হিসাবে গণ্য করতে থাকেন। আমি এত তাড়াতাড়ি বাসর চাইনি। কিন্তু আমার কথা মুরুব্বিরা শুনেননি। আব্বা আমাকে বলতে থাকেন, খোকা, তোমাকে কিছু করতে হবে না। কারণ তিনি দেখেছেন, পরীক্ষার পর আমি আরও বেশি মিছিল-মিটিং করতে থাকি। আরও বেশি মানুষের দুয়ারে দুয়ারে যাই। আমাকে আব্বা কখনওই সন্ধ্যার আগে বাড়িতে পান না। বোধ হয় সে জন্য তিনি গত রাতে আমাকে ডেকে বললেন:

"অন্তত আগামী চব্বিশ ঘণ্টা তোমার পরিববারকে একটু সময় দিয়ো।"

আমি আব্বাকে কথা দিই, আমি তা করব। আব্বা বলেন, "বউমার কথাটা মনে রেখো।"

আমি আব্বার উপদেশ বুঝেছি। তাই আমি সকাল নয়টায় বসন্ত আর গ্রীষ্মের মাঝামাঝি এই শুক্রবারে উঠানের এক কোনায় রেণুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি। এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে। কোনও বাক্য বিনিময় না করে।

এই নীরবতারও হয়তো অনেক মূল্য আছে। তবে সময়টা নীরবতার জন্য অনুকূল নয়। রেণুর চোখ বলছে, ওর ভিতর একটা সঙ্কট চলছে। কী সে সঙ্কট, তা জানা দরকার। আর তা কাটিয়ে ওঠার ব্যবস্থা করা দরকার।

রেণু ওর ঘাড়টা টান করে আমাকে দেখার চেষ্টা করে। মনে হয়, এর

জন্য, এক ঘণ্টা নয়, এক যুগ অপেক্ষা করে ছিলাম। কিন্তু হায়। রেণু আমাকে ওর দৃষ্টি দিল ঠিকই। তবে তা অচেনা চাহনি। যা দেখে আমার হাতের তালু আর্দ্র হয়, কব্জি পর্যন্ত শীতলতা ছড়িয়ে যায়। মনে হলো জীবনে প্রথম রেণু আমাকে দেখল। আমরা বুঝি চির-চেনা সেই দু'টি মানুষ আর নাই।

নিজেকে অসহায় লাগে। বুকটা টানটান হয়ে যায়। ভাবছি এ কি চার বছর আগের মিশন স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী সেই রেণু, যে আট বছর বয়সে আম্মার সহযোগী হয়ে আমাকে ঘোর বিপদে ভরসা দিয়েছিল।

কাকে এ-সব কথা বুঝাই? আমি, শেখ মুজিব, সায়েরা খাতুন আর শেখ লুৎফর রহমানের বড় ছেলে, যে জীবনমরণ ধৈর্যের পণ করেছে, সে জগৎময় মানুষের সামনে তার অস্থিরতা প্রকাশ না করারও প্রতিজ্ঞা করেছে। সে যে খোলস পরেছে, সে খোলস না হলে তার জীবনের কাজ চলে না। তার জীবনের সব আস্ফালন, সব জজবা, সব আলোড়ন, বাড়ির চৌহদ্দির বাইরের জন্য। অনুরাগের প্রকাশ আমার খাটে না।

নিজেকে ফাঁকি দেয়া হয় বটে, তবু আমি মনে করি, মানুষের কাছে যেতে চাইলে, তাদের মনের মতো করে নিজেকে সাজাতে হয়। এই যে মহামতি গান্ধী, আজ একুশ বছর ধরে সাহেবি স্যুট-কোট ফেলে মজুরের গামছা পরে খালি গায়ে ভারতবর্ষ চষে বেড়াচ্ছেন, তা কি নিছক অভিনয়? হতে পারে। তবে তার প্রয়োজনীয়তা যে তার চেয়েও বেশি। গান্ধীজির ভিশন আছে। মানবিক মন আছে। অসাম্প্রদায়িক চেতনা আছে। তিনি রাজনীতির মানুষ। মানুষের সাথে মেশার জন্য তিনি পোশাকের আরাম ত্যাগ করেছেন। আর তার ফলও পেয়েছেন। যখন ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে, তিনি হবেন তার রাষ্ট্রপিতা। তারপরও চূড়ান্ত বিচারে গান্ধীজিও আমাদের মতোই মানুষ। তিনিও রাগ, ক্ষোভ, বিরাগ, অনুরাগ সব কিছুর অধীন। শুধু আর দশ-জনের মতো তা বাইরে প্রকাশ করার সুযোগ তিনি হারিয়েছেন। আর আমার এখন যা দশা। মন চাইছে, দূরে গিয়ে মধুমতির জলে ডুব দিই।

রেণু ঠিক আমার বিপরীত। এমনকি স্বাস্থ্য আর গড়নের দিক থেকেও। ওর কখনও জ্বর হয়েছে বলেও আমি শুনিনি। হৃষ্টপুষ্ট নিটোল একটা মেয়ে। পিতা, মাতা, এবং তারপর একমাত্র অভিভাবক দাদাকে হারানোর বড় বড় দুঃখগুলোকে সে জীবনের অংশ হিসাবে এমনভাবে গ্রহণ করেছে, সব শোক ওর ভিতরে বিলীন হয়ে গেছে।

রেণুর রক্তও এসেছে ফোরাত নদীর তীর থেকে। শুধু তা-ই নয়, ওর শরীরে আর্য রক্তের চিহ্ন সম্পূর্ণ উদ্ভাসিত, যা আমার ক্ষেত্রে হয়নি। রেণুর সব কিছুতে আমাদের প্রপিতামহীদের চিহ্ন বিদ্যমান। যেন তাঁদের প্রত্যেকের

রূপের সুন্দরতম অংশটা ধারন করে সে পৃথিবীতে এসেছে। তবে পূর্বপুরুষদের লক্ষণ সব চেয়ে বেশি দেখা যায় ওর কটা চোখে।

রেণুর সেই চির-চেনা চোখের উপর আজ আমি চোখ রাখতে ব্যর্থ। কিন্তু আমার চোখ জুড়ানোর জন্য রেণুর চেয়ে ভালো কোনও দৃশ্যও পৃথিবীর কোথাও নেই। তাই আমি ঘুরে ফিরে রেণুর দিকেই চাই।

দুই সপ্তাহ আগে, এমন এক সকালে, যখন প্রথম বাড়িতে বাসরের কথা ওঠে, রেণুর গাল ছিল লাল, আজকের মতো, কিন্তু তাতে কাঠিন্য ছিল না। আমি দেখেছিলাম রেণুর আত্মবিশ্বাসী অঙ্গস্থিতি। রেণু খালি পায়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি ধূলা আর মাটির সাথে ওর সম্পর্ক দেখেছিলাম। বড় মমতার বাঁধন। যা ছড়িয়ে আছে পৃথিবীতে। সমতলে, গভীরে। গড়িয়ে পড়ে বাইগার আর মধুমতিতে। চলে যায় সমুদ্রে। উঠে পড়ে হিমালয়ে।

সেই সকালে আমার সামনে রেণু। আমাদের চারদিকে ঘিরে ছিল মানুষের পৃথিবী। গাছ, বাতাস, পাখি, আকাশ, মাটি, পুকুর, নদী, বিড়াল, কুকুর, হাঁস, মুরগি। প্রকৃতির শোভা। ফুলের গন্ধ। এক পলক চোখ বন্ধ করে গ্রহণ ক্ষমতার সকল দ্বার উন্মুক্ত করেছিলাম। পণ করেছিলাম কোনও অসচেনতায় ওই মাধুর্যকে হারিয়ে যেতে দিব না। না মৃত্যুর আলোতে। না মায়ার সাগরে। না এ দুইয়ের মাঝে ছড়িয়ে থাকা বিস্তৃত জীবনে।

তখন মাথার উপর কড়ই গাছের পাতাগুলো সকালের সূর্যে জেগে উঠেছিল। আমার কানে বেজেছিল পাতার বাঁশির নির্মল সুর। আমি দেখেছিলাম দোয়েল পাখির পেট, কাঠবিড়ালির দৌড়, চড়ুই পাখির লাফ, কাঠঠোকরার অধ্যবসায়। বাড়ির দেয়াল ঘিরে ছিল গাদা ফুলের মিছিল। হলুদ রং কত উজ্জ্বল। রেণুর প্রভাবে পৃথিবীর প্রতি আমার মনোযোগ নিবিড়তর হয়েছিল। আমি মধুমতির স্রোতের আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলাম। শুনতে পেয়েছিলাম বাইগার নদীতে সাঁতারকাটা শিশুদলের কল্লোল। কলা গাছের পাতায় ছিল বাতাসের শোঁ-শোঁ আওয়াজ। সবচেয়ে ভালো লেগেছিল রাতের তরফ থেকে রেখে যাওয়া রজনীগন্ধ্যার সুবাস। গোলাপ গাছগুলো দূরে, বাড়ির পিছনে। আমি মনের চোখে দেখতে থাকি, গোলাপের কুঁড়িগুলো ফুলে-ফেঁপে বড় হচ্ছে, আর ধীরে ধীরে লাল পাঁপড়িগুলো খুলে গিয়ে পৃথিবীকে সমৃদ্ধ করছে। পেয়েছিলাম গোলাপের গন্ধ।

অজস্র ক্লান্তিহীন সুগন্ধ আমার নাকে প্রবেশ করেছিল। শামুকের গন্ধযুক্ত মাটি থেকে আসা বাতাসের কোমল ভাপ যেন মন ভালো করার ওষুধ। টুঙ্গিপাড়ার এই সৌন্দর্যের প্রতি রয়েছে আমার অসীম কৃতজ্ঞতা। ফোরাত নদীর তীরের প্রপিতামহকে এই প্রকৃতি আকর্ষণ করেছিল। তাই তিনি মরুভূমি ত্যাগ করে সবুজ-ঘেরা মধুমতিকে আপন করে নিয়েছিলেন। মধুমতিতে তিনি সাঁতার কেটেছেন, নেয়েছেন, যেমন আমি এ-পাড় ও-পাড় করেছি বাইগার নদী, যা মধুমতির এক সন্তান। মরুভূমি ছেড়ে এসে আমরা সবুজ আম আর কাঁঠাল বাগান, ধূলিমাখা হিজল আর তমালের বনের মাঝে আমাদের জীবন গেঁথে নিয়েছি। আমরা হয়েছি মধুমতির সন্তান। এর পলিমাটি থেকে আমাদের উত্থান। আর প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে আমরা শেখ গোষ্ঠীর সব সন্তান এক দিন এই পলি মাটিতে মিশে যাব। এই মাটি থেকে শুরু হবে আমাদের মহাবিশ্বের সাথে মহামিলন। এই শ্যামল স্নিগ্ধ টুঙ্গিপাড়ায়।

টুঙ্গিপাড়ার প্রতি শেখ বংশের যে মায়া বেড়ে চলেছে সে-দিন রেণুর কারণে আমাতে এসে তা পূর্ণতা লাভ করেছিল। রেণু তখন হাজার ফুলের নির্যাস হয়ে সারা টুঙ্গিপাড়ায় ছড়িয়ে গেছে, মিশে গেছে জলে আর বাতাসে, পাতায় আর ধুলিতে। আমি চোখ বন্ধ করে টুঙ্গিপাড়ার গন্ধ, স্পর্শ, তাপমাত্রা, আবহাওয়া, শব্দ, রোদ, বৃষ্টি, কুয়াশা, আলো, আঁধার সব কিছু আলাদা করে চিনতে পারি। রেণুর কারণে টুঙ্গিপাড়ার সব কিছু এত মধুমাখা। এক দিন আমি আর রেণু ঘুমিয়ে থাকব এই টুঙ্গিপাড়ার মাটিতে। শুনব মধুমতির তীরের বৃষ্টির শব্দ, কালবৈশাখীর আওয়াজ, ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক, কেঁচো আর কাঁকড়ার আহজারি, কোকিলের সুর। দেখব বক পাখির উড়ন, গন্ধ নিব পলিমাটির, গায়ে মাখব হেমন্তের রোদ। জোনাকির জ্বলা দেখব, ধানের সবুজ পাতায় আঁকা শিশির বিন্দুর জাল দেখব, শুনব বজ্রের গর্জন। চোখ ধাঁধাবে বিজলির ঝলক। দেখব মেঘের নৌকায় চাঁদের চলা, কিংবা কোনও এক মেঘমুক্ত রাতে হঠাৎ কোনও উল্কাপাত।

আমি আমাকে বলেছিলাম, মধুমতি যেমন সাগরে স্থিতি পেয়েছে, তুইও তেমন রেণুতে বিলীন হয়ে থিতু হ। পরিধি যত বাড়াবি, স্থিতি তত বাড়বে। আমি আমার মাথা, মুখ, গলা, ও ঘাড়ে রক্ত চলাচল অনুসরণ করেছিলাম। অনুভব করেছিলাম হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন। যকৃত আর বৃক্কের উপর নিশ্বাসের চাপ আরামদায়ক মনে হওয়ার পর আত্মবিশ্বাস বেড়ে গিয়েছিল।

সে দিন আমি নিখুঁতভাবে অনুসরণ করতে সক্ষম হয়েছিলাম আমার ভিতর প্রবেশ করা বাতাসের জীবনরক্ষাকারী উপাদানসমূহ। প্রশ্বাসের সাথে কী করে ফুসফুসদ্বয় হৃৎপিণ্ডকে কোমল পরশে আলিঙ্গন করে। অনুভব করেছিলাম আমার

মাথা থেকে পা পর্যন্ত নেমে যাওয়া শান্তির শীতল প্রবাহ। আর শান্ত হতে থাকা বুকের স্পন্দনগুলোও। হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল অম্লজানপূর্ণ বিশুদ্ধ রক্তের ধারা। মাথা থেকে হাত ও পায়ের আঙুল পর্যন্ত বেয়ে বেয়ে। মেরুদণ্ড ঘিরে থাকা পেশিগুলো শিথিলর শিথিল হওয়া অনুভব করি। অনুভব করি আমার মেরুদণ্ডের শক্তি।

মনে হল আমি বুঝি আর একটু লম্বা হয়ে গেলাম। আর আমি তখন মাটির উপর পায়ের চাপ ধরতে চেষ্টা করেছিলাম। বাংলার উর্বর মাটি। শামুক আর কেঁচোর কারুকাজে সমৃদ্ধ মাটি। মধুমতির পলিতে পুষ্ট আর মন ভালো করে দেওয়া দোঁয়াশের মিষ্টি গন্ধযুক্ত আপন মাটি। যেন ওরা সবাই কৃতজ্ঞতায় পরিপুষ্ট। সব কিছুর জন্য আল্লাহকে ধন্যবাদ দিয়েছিলাম। পৃথিবীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে গিয়েছিল। রেণুকে পেয়ে রেণুর জান্নাতবাসি পিতাও এক দিন আল্লাহকে এমনভাবে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন। যদিও সে সুখ তিনি তিন বছরের বেশি পাননি।

আমার সুখের মতো সুখ সবার জীবনে আসুক, সে কামনা করেছিলাম দুই সপ্তাহ আগে। আবার দুঃখও পেয়েছিলাম। কারণ ওই সুখ সবাই পায় না। ওই সুখের খোঁজে কত জন গলায় দড়ি দিল, কত জন বিষ খেল, কত মানুষ উপদংশে বিক্ষত হয়ে পাগলা গারদে গেল। আর আমাকে কখনও এমনকি গঞ্জিকাও সেবন করতে হলো না। আমার এই অভাবের দেশের মানুষের বিলাসিতা বলতে আছে মাত্র দুটি জিনিস: তামাক আর পান। আমি তামাক বেছে নিয়েছিলাম। এর বেশি কিছু নয়। মনে মনে বলেছিলাম, রেণু তুমি এখানে থাকো। রেণু তুমি নড়ো না।

রেণু নড়েনি। রেণু অনড় ছিল। রেণু যেন ঝড়-ঝঞ্ঝা-বিদ্যুৎ-আঘাত সব শুষে নিতে পারে।

সেই সকালের কথা ভাবতে ভাবতে মনে সাহস সঞ্চয় করে আমি আর এক বার রেণুর চোখে চাই। আর তখন এক ঝাঁকুনিতে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে পড়ে যাই। রেণুর চোখ-পাথর এর মধ্যে আরও ঘনীভূত হয়েছে।

"রেণু।" আমি অস্ফুটে বলি।

রেণু আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত এক বার দেখে নেয়।

জীবনটাকে মরীচিকা মনে হয়। তারপরও আমি কথা বলি, যদিও গলাটা বন্ধ হয়ে যেতে চায়।

"সে রাতের কথা মনে আছে, রেণু?"

রেণু ঘুরে দাঁড়ায় যেন আমি তার মুখ দেখতে না পাই।

"রেণু?"

"বলেন।"

আমার আর কিছু বলার ইচ্ছা থাকে না।

রেণু মাত্র পাঁচ বছর গোপালগঞ্জের মিশন স্কুলে পড়েছে। পড়তে শিখেই সে বই পড়া শুরু করেছে। যে বয়সে গল্প পড়ার কথা নয় সে বয়সে সে উপন্যাস পড়েছে। গোপালগঞ্জের বাড়িতে সে এক একটা লাইন পড়ত আর আমাকে তার অর্থ জিজ্ঞেস করত। আমি কবিতা আর গান ভালোবাসি। উপন্যাস পড়ার সময় আমার খুব কম। তবে রাজনৈতিক কোনও উপন্যাস না পড়ে হাতছাড়া করি না। এরপরও রেণু আমাকে দিয়ে অনেকগুলো উপন্যাস পড়িয়েছে। *দত্তা* উপন্যাসটা রেণুর মুখস্ত। শরৎ রচনাবলী দিয়ে শুরু। তারপর রবীন্দ্রনাথ আর বঙ্কিম। কত দিন সমাস আর সন্ধি বিচ্ছেদ করে আমি রেণুকে কত কথার অর্থ ব্যাখ্যা করেছি:

খদ্যোতমালাসংবৃত,
হেমাম্বুদকিরীটিনী,
সপ্তমীচন্দ্রাকৃতিললাটতলস্থ,
চন্দ্ররশ্মিবর্ণশোভিনী,
বিষমোজ্জ্বলজ্বালাবিভাসিতলোচনপ্রান্তে,
রজতকিরীটমণ্ডিতশিরোদেশসুশোভিনী।

আমি পড়েছি, রেণু শুনেছে। রেণু পড়েছে, আমি শুনেছি। *সেই অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে, বসন্তবায়ুবিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আন্দোলিত হইতে হইতে নবকুমার ও কপালকুণ্ডলা কোথায় গেল?*

ছয় মাস আগের কথা। রেণু প্রথম বারের মতো *কপালকুণ্ডলা* পড়ে শেষ করে আমাকে জিজ্ঞাসা করে, "আমাদের বিয়ে সম্পর্কে আপনার কী মত?"

প্রশ্ন শুনে আমি নির্বাক। রেণুর মন মতো হয় এমন কোনও উত্তর দিতে না পারলে ও দুঃখ পাবে, এই ভেবে আমি কোনও মত না দিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করি, "তোমার কী মত?"

"কপালকুণ্ডলাতো জেনেবুঝে বিয়ে করেছিল, তাই না?"

"তাইতো বটে।"

"আমিতো কিছুই বুঝিনি।"

"কিসে তোমার সঙ্কোচ আর দ্বিধা, রেণু?"

"আমি একটা ক্ষুদ্র বালিকা।"

"তাতে কী হয়েছে?"

"গত কয়েক দিন আমি একটা লাইন বার বার পড়েছি।"

"কোন লাইন, রেণু?"

"*যদি জানিতাম যে, স্ত্রীলোকের বিবাহ করা দাসীত্ব, তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না।*"

কথাটা বলতে গিয়ে রেণুর চোখ দুটি ভিজে যায়। ওর কটা চোখে অশ্রুকে স্ফটিকের মতো লাগে। আমি ভাবছিলাম কী বলে রেণুকে সান্ত্বনা দেওয়া যায়। রেণু ভবিষ্যতের কথা বলছিল। যা তখন প্রমাণ করার কোনও উপায় ছিল না। আমি বলেছিলাম, "রেণু, আজকের দিনকে আজকের মতো গ্রহণ করো। এখন যদি তোমার নিজেকে সুখী মনে হয়, ধরে নাও সারা জীবন তোমার সুখে কাটবে।"

আমরা দুজন বাইগারের পাড়ে যাই। বটগাছের ছায়ার নিচে মসৃণ ধূসর মাটির উপর বসি। রেণু বাইগার এর ঢেউয়ের দিকে নিবিষ্ট মনে তাকিয়ে

থাকে। আমি ওর চোখে-মুখে বিষণ্নতা দেখি। কলকল ঢেউগুলো আমার বুকে বিচ্ছেদের ব্যথার মতো বাজতে থাকে। আমিও নদীর স্রোতে কপালকুণ্ডলাকে খুঁজি। তবে রেণুর কাছে হার মেনেছিলাম যখন ওর চোখ দু'টি থেকে অশ্রু-বাষ্প নেমে এসেছিল।

"একটা কথা বলবেন?"

"বলো, রেণু।"

"কপালকুণ্ডলা গল্পটা আপনার কেমন লেগেছে?"

"অনেক ভালো।"

"আর কিছু না?"

"গল্পটা আর একটু বড় হলে ভালো হতো।"

"আপনি কি ভাগ্যে বিশ্বাস করেন?"

"গল্পের ভেতরে এমনভাবে ঢুকে গেলে জীবন চলে না, রেণু।"

রেণুর সাথে এমন একান্ত সময় আর কখনও কাটানো হয়নি। বাইশ বছরের জীবন আমার। অল্প বয়সে রাজনীতি, একটিভিজম, দাতব্যের কাজ ইত্যাদি করতে গিয়ে নিজের জন্য কোনও সময় রাখিনি।

তাই রেণুর সাথে আমার যোগাযোগের ঘাটতিটা আমি ধরতে পারিনি। আজ স্পষ্ট বুঝতে পারছি, রেণুর সাথে আমাদের যুগল জীবনের সকল কথা বলার সময় হয়নি, একতরফাভাবে আমার এমন সিদ্ধান্ত নেয়া ঠিক হয়নি। রেণুতো আমার পেছনে অনেক ঘুরেছে। আমি এগিয়ে আসিনি। রেণুর সাথে ভাষার বিনিময়ের জন্য অপেক্ষা করা আমার বোকামি ছিল।

পরিবার, সমাজ, প্রথা কোনও কিছুর উর্ধ্বে আমার জীবন নয়। বরং এগুলো নিয়েই আমার জীবনের কাজ। এগুলো ছাড়া বেঁচে থাকা আমি কল্পনা করতে পারি না। আমি একজন মানুষের পরিপূর্ণ জীবন চাই। ঘরের ভিতরে। ঘরের বাইরে। জীবনে গতি থাকবে। আমি কোনও কিছু থেকে বিরত থাকব না। রেণু ছাড়া আমার নিষ্কলুষ জীবন হবে না।

আমি রেণুর টাকায় রাজনীতি করি। চার বছর ধরে ও আমাকে সাহায্য করে চলেছে। টাকা ছাড়া আমার কাজের গতি থাকে না। টাকা আসে আব্বা, আম্মা আর রেণু থেকে। রেণু কথা না বললে আমি কী করে শান্ত থাকি।

ইচ্ছে করছে ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুমের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টার যেটুকু অবশিষ্ট আছে তা পার করে দিই। উঠানের আর এক কোনায় চোখ যায়। আব্বার ব্যস্ততা দেখে মায়া লাগে। বাসরের আয়োজনে গতি এসেছে। চোখে পেঁয়াজের রসের ঝাঁঝ। বাতাস নিয়ে এল। দূরে এক ব্যক্তির সামনে এক বস্তা

পেঁয়াজ। বস্তার মুখ খোলা। পলির রঙে রূপান্তরিত হওয়া সাদা শার্ট পরে লোকটা একটা করে পেঁয়াজ টেনে নেয়, চামড়া খোলে আর বটির উপর তা কাটে। কেটে ফালিগুলোকে একটা ডেকচিতে রাখে। তার আশে পাশে আরও অনেক মানুষ। তাদের কারও সামনে মরিচ, কারও সামনে রসুন, কারও সামনে আদা, কারও সামনে গোলমরিচ, কারও সামনে অন্য কোনও মসল্লা যার গন্ধ পাচ্ছি কিন্তু যা এখান থেকে ঠাহর করতে পারছি না। মসল্লার গন্ধ বুঝিয়ে দেয় এমন সময় ঘুমের চিন্তা অবান্তর।

একটা কথা ভেবে আমার ডান মুষ্টি কপালে ওঠে। আজকের দিনের সঙ্কট না হয় কাটিয়ে উঠলাম। আব্বার বেঁধে দেয়া চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই। তারপর কি সঙ্কট কেটে যাবে? রেণু যে মমতা আমার ভেতর ছড়িয়ে দিয়েছে, তা যদি এক দিন আমাকে আমার কাজ থেকে কেড়ে নেয়। আমিতো তা চাই না। অসহায় ভারতবর্ষের কথা মনে আসে। ইংরেজ তাড়াতে হবে। হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষ এসে ইংরেজমুক্ত ভারতকে থাবা দিয়ে ধরবে। সেই থাবা থেকে জাতিকে কে রক্ষা করবে? যে দেশের সমস্যা এত জটিল, সে দেশের ভবিষ্যৎকে একটুখানিও যদি কন্টকমুক্ত করতে হয়, তার জন্য দিনরাত কাজ করা দরকার। আমি সে কাজের ব্রত থেকে কীভাবে সরে আসি? এত দিন মনে হয়েছে রেণু কখনও আমাকে বাধা দেবে না। আজকে রেণুর বিরল মূর্তি আমাকে কাঁপিয়ে দিল। মনে হচ্ছে রেণু আমার বাইরের জীবনটাকে আর মেনে নিতে রাজি নয়।

আমার বাইশ বছরের জীবনের সব পরিকল্পনা নস্যাৎ হতে চলেছে, এমনটা ভেবে আমার চোখ দু'টিতে আগুন অনুভব করি। দেশের স্বাধীনতা অর্জনে ভূমিকা রাখতে পারব না, এমন কিছু মেনে নেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। রেণু যদি কখনও আমার জীবনে না আসত, আমি আজকের এই দোটানায় পড়তাম না। কিন্তু চাইলেইতো আর রেণুর গলা চিপে ধরা যায় না। ইংরেজ ছাড়া আরে কাউকে মধুমতিতে চুবিয়ে মারা আমার কাজ নয়। কী করি আমি? রেণু যদি কোনও দৈববলে নিরুদ্দেশ হয়, তারপর কিছু দিন শোক করব, তারপর ভুলে যাব। কিন্তু এখন কি এ-সব দিবাস্বপ্ন দেখার আর অবকাশ আছে? রেণু, তুমি কি আমাকে কখনও ঘরে আটকে রাখতে চাইবে? আমিতো ঘরের বার হয়েই গেছি। এখন কী করে আমার পক্ষে আবার উল্টো পথে হাঁটা ধরা সম্ভব?

রেণু বুঝি আমার মরিয়া-ভাব খেয়াল করে। ওর চোখ দু'টি জ্বলে ওঠে।

আবার নিভেও যায়। আমি চোখ বুজে অশ্রুর হুল বন্ধ করার চেষ্টা করি। চোখের পাতার নরম মাংসে অক্ষিপক্ষ্মের খোঁচা খাই।

আজই এ সমস্যার একটা চূড়ান্ত বোঝপড়া করে ফেলা দরকার। আজই শেষ সুযোগ বিয়েটা ভেঙ্গে দিয়ে রেণু আর আমি চিরদিনের জন্য ভাইবোন হিসাবে জীবন শুরু করা। কাল আর সেই সুযোগ থাকবে না।

হাম্বা!

একটা কালো গরুর ডাকে আমরা বর্তমানে ফিরে আসি। উঠানের ব্যস্ত অংশে আমার চোখ যায়। একটা গরু আর দু'টি খাশি আনা হয়েছে। ওদের জবাই করা হবে।

আমি রেণুর অনড় দাঁড়িয়ে থাকা অনুভব করি। রেণুর এ এক অসীম শক্তি। আমার উপর। এ শক্তি অপরাজেয়। যে শক্তি বাতাসে ভেসে আসে তাকে আমি কী দিয়ে রুখব? রুখতে যদি না পারি? তখনতো মাত্র একটি উপায় থাকে। নিজেকে পরিবর্তন করে ফেলা। দেশের কথা ভুলে যাওয়া। সব কিছু ছেড়ে দিয়ে রেণুর বাতাসে মিশে যাওয়া।

রাজনীতিতে শরীরকে অনেক কষ্ট দিতে হয়। তাই শরীরের আরামের চিন্তা আমাকে প্রলুব্ধ করে। টুঙ্গিপাড়ার এই বাড়ি আর যদি কখনও ত্যাগ না করি? রেণু অনেক খুশি হবে। আর এই ব্যবস্থা করা কোনও ব্যাপারই না। স্বাধীনতার সংগ্রাম ছেড়ে দিলে বরং পুলিশের লাঠি, জেলের ভাত, সাম্প্রদায়িক শক্তির কিল-ঘুসি-ছুরি ইত্যাদি থেকে রক্ষা পাবো। কতক প্রপিতামহতো পাশা খেলেই জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। আব্বার আর আম্মার আর রেণুর জমিতে হালচাষ করে যা পাব তাতো আমার জন্য যথেষ্ট। গরম ভাত, রুই মাছের ঝোল, সজনে ডাটার আকর, মাসকলাই ডাল, আমের রস, কাঁঠালের কোয়া, চম্পা কলা, গরুর দুধ, রেণুর মায়া। আর কী কী চাই জীবনে?

রেণুর সংসারে ঘরকুনো স্বামী হয়ে দিনাতিপাত করার বিষয়টা আমাকে আকর্ষণ করে। কেন যে ঘরের বাইরে গেলাম? কেন যে গরিবদুঃখী মানুষের চোখের দিকে চাইলাম? কেন যে শহীদ সাহেব আর হক সাহেবের সাথে দেখা হয়ে গেল? কেন যে সুভাষ বসুর নামে মিছিল করতে গেলাম? শহীদ সাহেবের চিঠিটা না পড়ে যদি ছিঁড়ে ফেলে দিতাম!

তাহলে আজ আমি এই দোটানায় পড়তাম না। বড় একটা শ্বাস বুকের গহীন থেকে সবেগে বের হয়ে আসে। আমি থামাতে পারি না। রেণু সেটা টের পায়। আর ওর পিঠও আরও একটু শক্ত হয়ে যায়।

আমি নিজেকে প্রশ্ন করি, সমস্যাটা কি আমার, না রেণুর? আমি কি নিজের ভিতর তাকিয়েছি?

হ্যাঁ, তাকিয়েছি। খুঁজেছি যা দেখতে চেয়েছি। যা দেখতে চাইনি, তার দিকে তাকাইনি। আমি বুঝলাম নিজেকে আমি একটা জায়গায় ছাড় দিয়েছি। আমি তার জন্য লজ্জিত হই।

সক্রেটিস যখন বলেছিলেন, নিজেকে জানো, তখন অনেকে তার অর্থ বুঝতে পারেননি। অনেকে তা মামুলি কথা বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। আজ যখন ওই শব্দ দু'টি পৃথিবীর অন্যতম প্রধান প্রবাদ হিসাবে স্বীকৃত, তখনও পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ তার অর্থ বুঝেন না। আর অন্য দিকে অনেক জ্ঞানী-গুণী তার নতুন নতুন অর্থ করে চলেছেন। সক্রেটিস তাঁর প্রবাদে আত্মানুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন। এটা যে কঠিন কাজ, সক্রেটিস তা বুঝেছিলেন। আজ রেণুর সম্মুখীন না হলে হয়তো আমি নিজেও সক্রেটিসের কথার গুরুত্ব এভাবে কখনও উপলব্ধি করতে পারতাম না।

হামিদ মাস্টার আমার মনের প্রশিক্ষণ শেষ না করেই ইহধাম ত্যাগ করেছিলেন। আমি ব্রতচারে ঢুকলাম, শিক্ষাটা শেষ করব, এই আশায়। ব্রতচার জীবনের গুরু গুরুসদয় দত্তকে এক দিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, গুরুজি, মন জিসিটা কী? গুরুজি বলেছিলেন, "যাহা তোমাকে কর্তব্য হইতে বিচ্যুত করিবে, ধরিয়া লইও, তাহাই মন।" আমি উহা তেমন ভালো করিয়া ধরিয়া লইতে পারিলাম না। তবে ইহা বুঝিতে পারিলাম, মস্তিষ্কের কার্যকলাপ হলো মন। ওই সময় মনকে খাটিয়ে নিয়ে আমি মনের কিছু ধর্ম চিনতে পারি। আমি জানতে পারি মানুষের মনের ধর্ম হলো তাকে বার বার উৎকণ্ঠার রাস্তায় ঠেলে দেয়া। অলীক ব্যথা-বেদনা-দুঃখ-কষ্ট রচনা করা হলো মনের অমোঘ নেশা। অতীত আর ভবিষ্যতে বিচরণ না করে সে একদণ্ড শান্তি পায় না। আর সে

কী হইবে কী হইবে, কী কী খারাপ জিনিস ঘটিবে, রাস্তায় কত জঙ্গল, কত কাঁটা, কত বাঘ-ভাল্লুক, কত বজ্র কত বিজলি, কত চোর কত ডাকাত, চৌকির নিচে কত পান্নস সাপ, ছাদের বিম থেকে কখন টিকটিকি আছাড় খেয়ে বুকের উপর পড়বে, ইত্যাদি সব দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি করে সর্বদা একটা গোলযোগ বাধিয়ে রাখে। শ্রদ্ধেয় গুরুসদয়জিকে আমি আমার আবিষ্কার বুঝিয়ে বলি। তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে নেন। বলেন, "বাবা মুজিব, আমি তোমাকে যাহা বুঝাইতে অক্ষম ছিলাম, তুমি তাহা বুঝিতে সক্ষম হইয়াছ। আর ইহাও জানিয়া রাখো যে, সুখ আহরণ মনের কাজ নয়, দেহের কাজ। মনের কাজ হইল দুঃখ আহরণ করা। মন যখন ঘুমাইয়া থাকে তখনই কেবল আমরা আমাদের দেহে প্রকৃত আনন্দ অনুভব করিতে পারি।"

গুরুজির কথায় আমি অভিভূত হই। এমন আনন্দ আমি নিজেই অনুভব করেছিলাম, বেরিবেরি রোগে অচেতন হওয়ার ঠিক আগে। জীবনে আর কখনও সেই শান্তি পাইনি। তবে তার অভিজ্ঞতা আমার সঞ্চয়ে আছে।

"বাবা মুজিব," গুরুজি বলেন, "আমি এখন তোমাকে মন নামক উচ্ছৃঙ্খল পশুটাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার একটা পদ্ধতি শিখাইয়া দিব।"

গুরুজি বলেছিলেন, আমি যা-ই করি না কেন, মনকে শান্ত রাখার জন্য আমি যেন সে-কাজে আমার সমস্ত দেহকে নিয়োগ করি। গুরুজি যখন এ কথা বলেন তখন আমার মনে পড়ে শৈশবে দেখা এক স্বদেশী আন্দোলনের বিপ্লবীর কথা যিনি আহত অবস্থায় একমনে আকাশ দেখছিলেন। গুরুজির উপদেশ আর বিপ্লবীর আকাশ-দর্শন মিলে যাওয়াতে আমার আর কোনও সন্দেহ রইল না যে, এটা জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় একটা শিক্ষা।

সে দিন থেকে আমি সব কাজে দেহকে নিয়োজিত করি। আমি যখন খাই তখন আমার সারা দেহ তার স্বাদ অনুভব করে। আমি যখন গোসল করি তখন সমস্ত দেহের অনভূতি দিয়ে আমি পানির ধর্মে ডুবে যাই। আমি এমনভাবে প্রাতঃকৃত্য সারি যেন সমগ্র দেহ ভারমুক্ত হয়। যখন শ্বাস ছাড়ি তখন শরীরের প্রতিটি কোষ থেকে বিপাককৃত বিষবায়ু বের করে দিই। যখন জনে জনে গিয়ে স্বাধীন দেশের স্বপ্ন দেখাই, তখনও আমি শুধু মগজ দিয়ে আমার কথা বলি না, আমি তখন দেহকেও সচেতন রাখি, আমার দেহের প্রতিটা কোষ কথা বলে, আর তাতে করে আমি মানুষের মনের সাথে আমার সংযোগ সুদৃঢ় করি।

এই কাজগুলো বলা যত সহজ, করা তত সহজ ছিল না। মন নিয়ন্ত্রণের বিদ্যাটা দৈনিক হাজারবার মনে মনে আওড়ালেও সঠিক সময়ে তার উপায়গুলো প্রয়োগ করার কথা অনেক প্রয়োজনীয় মুহূর্তেও স্মরণে আসত না। তখন আমি আমার অনুশীলন আরও কঠোর করি। আর সেই পথ ধরে

আজ আমি এখানে আসি।

এত কিছু বোঝার পরও আমি আব্বার চব্বিশ ঘণ্টার আহ্বানে সাড়া দিয়ে মনকে একটা অসচেতন মুহূর্তে কিছু সময় ইচ্ছে মতো চলার জন্য স্বাধীনতা দিয়ে দিই। আর সেই ভুলের মাশুলই আমি সকাল থেকে দিয়ে গেলাম।

মনের এই ধৃষ্টতাকে আমি আর এক বিন্দু ছাড় দিতে রাজি নই। দীর্ঘ একটা শ্বাস নিয়ে আমি তাকে একটা আছাড় দিই। বুঝতে পারি কিছুটা হলেও কাজ হয়েছে। দ্রোহের তেজ ধীরে ধীরে কমে আসছে। চতুর্থ শ্বাসেই সে আমার দেহের সাথে মিশে যায়। আমি এতটা কঠোর হতে চাইনি। কিন্তু দেখলাম, মনের কোনও বিচ্যুতি, এমনকি জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিনে হলেও, তা ক্ষতি করতে এতটুকু দ্বিধা করে না।

আমি প্রতেক শ্বাসের সাথে প্রকৃতির বিশুদ্ধতা গ্রহণ করি আর প্রত্যেক শ্বাসের সাথে দেহে জমা হওয়া স্নায়বিক চাপ বের করে দিই। প্রক্রিয়াটা কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করার পর শরীরে পুলক অনুভব করি। আমার ভারসাম্য ফিরে আসে। আমি হাত আর পায়ের তালুতে মনোনিবেশ করি। তারপর আমার মনোযোগ আমার পা হয়ে, গা বেয়ে, ভেতরের অঙ্গগুলোকে মসৃণ ভাবে ছুঁয়ে ছুঁয়ে উপরে উঠতে থাকে। আমার ঘাড় আর গলার পেশিগুলো শিথিল হয়। আমি মাথার ভিতর রক্ত স্রোত আর স্নায়ুর চাঞ্চল্য শান্ত হওয়া লক্ষ করি।

আর এভাবে আমি আমার চারিদিক ঘিরে থাকা মানুষ, পশু, পাখি, প্রকৃতি সব কিছুকে একটি নিরবচ্ছিন্ন সত্তা হিসাবে অনুভব করি। প্রথমে তারা আমার সামনে পৃথক পৃথক জীব ও জড় পদার্থ হিসাবে আবির্ভূত হয়। তারপর আমি অন্তরের চোখ খুলি। দেখি এক মহাশূন্য। যার নাম মহাবিশ্ব। বস্তুর একক যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা – প্রোটন, ইলেকট্রন, নিউট্রন – তাদের মাঝে তাদের চেয়ে বহুগুণ বড় শূন্যস্থান দেখি। দেখি মহাবিশ্বের মাঝে আমরা সবাই ক্ষুদ্র কণিকা দ্বারা গঠিত এক একটি শূন্য বস্তু। মহাশূন্যে নিজেকে বিলীন করে আমি নিজেকে খুঁজে পাই। আমার ভেতরের রিপুগুলো নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। আমি আমার প্রকৃত আমিকে জানতে পারি।

সক্রেটিসকে শতকোটি সালাম।

প্রকৃত আমি অনাদিকালের রেণুকে খুঁজে পাই আমার অনুভবে। রেণু হয়ে যায় আমার সুখের আধার। চেয়ে যা পাওয়া যায় না। যা দিয়ে পেতে হয়। আমি রেণু থেকে শেখা বিদ্যা কাজে লাগাই। আমি রেণুকে অনুভব করি। যে রেণু নির্মিত হয়েছে, পরিপুষ্ট হয়েছে, পূর্ণতা লাভ করেছে, ফোরাত থেকে মধুমতী পর্যন্ত বিস্তৃত পৃথিবীর আকাশ, বাতাস, মাটি, জল, বৃক্ষ, শস্য, পশু, পাখি, শোভা, সৌরভ আর মাধুর্যের নির্যাস গ্রহণ করে, প্রজন্ম থেকে

প্রজন্মান্তরে।

কব্জির উপর পড়া সূর্যের তাপ আমার সারা দেহে প্রবাহিত হয়। যদি এ-ভাবে এই শক্তি নিয়ে চলতে পারি, তবে আজকের সমস্যা উৎরে যাব। ভিতরের সংগ্রাম, স্মৃতি, অনিশ্চয়তা, বিরোধ ইত্যাদির বিবিধ উর্মিমালা প্রশান্তির সাগরে বিলীন হয়ে যাবে।

এ দিকে পৃথিবী থেমে নেই। আমগাছের ডালের উপর বক পাখির বাসা নড়ে। জামগাছের শাখায় বড় বড় জাম। রং ধরতে শুরু করেছে। এক একটা জামের অর্ধেক সবুজ, অর্ধেক খয়েরি। এক সময় তারা পাকবে। পেকে জামগুলো কালো আর সুস্বাদু হবে। আমগুলোর রং যেন আমার চোখের সামনে বদলে যাচ্ছে। আমি নারকেল পাতার কনকন শব্দ শুনি। সূর্যের উত্তরণ থেকে বোঝা যায়, পৃথিবীও ঘুরছে।

অনড় শুধু রেণু। আমার নব চেতনা নতুন বুদ্ধির কপাট খুলে দেয়। গতিশীল সব কিছু আপন শক্তি ক্ষয় করে চলেছে। রেণু তার শক্তি সঞ্চয় করে রেখেছে। নিয়ন্ত্রণহীন অণুর শক্তি পৃথিবীকে যেমন ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে বলে বিজ্ঞান বলতে শুরু করেছে, সেই শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে আবার বিদ্যুতের মতো অতি প্রয়োজনীয় শক্তিও মানব ও প্রকৃতির কল্যাণে ব্যবহার করার আশা তৈরি হয়েছে। রেণুকে দেখে মনে হয়, বৈশাখী ঝড় কিংবা মধুমতির প্লাবন, কোনও কিছুই ওকে টলাতে পারবে না। এই মহাশৈলিক ঐন্দ্রিলা রেণু এক দিন আমাকেও শক্তি যোগাবে। সেই শক্তি অধিকার করার জন্য কিছু সাধনাতো করতেই হবে। প্রতিরোধের পথ ছেড়ে আমি গ্রহণের পথে হাঁটি। উপলব্ধির হাওয়া আমার ত্বকের উপর শীতল সুখের প্রলেপ মেখে যায়।

আমি দৃপ্ত কণ্ঠে প্রতিটা শব্দ উচ্চারণ করি। "রেণু, তুমিতো আঘাত পেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছো। আমরা সবাই তার স্বাক্ষী। এখন কি পারবে না? চেষ্টা করে দেখো। তুমি পারবে। আমার মন বলছে তুমি পারবে। এখন আমার হয়তো আর কিছু করার নাই। আমি শুধু আব্বার অনুরোধটা রাখতে পারি। এই চব্বিশ ঘণ্টা তোমার হয়ে থাকতে পারি। এই চব্বিশ ঘণ্টায় তুমি যদি পাহাড়ের মতো ভারীও হয়ে থাকো, আমি তোমাকে বহন করব। তারপর কী হবে, রেণু? তুমিই বল। আমি আমার সিদ্ধান্ত তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি। শোনো, রেণু, কোনও যুদ্ধেই আমি হারব না। না তোমার কাছে? না ইংরেজের কাছে। সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত অম্লকে সম্প্রীতির শক্তিশালী ক্ষার ঢেলে আমি ধ্বংস করব। এই ঔপনিবেশিক পরাধীন রাষ্ট্র-শক্তি আমার শত্রু। সেই শত্রুকে ভারত মহাসাগরে জাহাজে তুলে দেয়া পর্যন্ত আমি তোমাকে মিত্র হিসাবে চাই। আমি তোমাকে জয় করব। শত্রুতে বিনাশ করব। আমাকে

দুটোই করতে হবে, রেণু। বাকি সিদ্ধান্ত তোমার।"

আমি খুব সাবধানে কথাগুলি বলি। আর প্রতিটা শব্দের মানে জেনেই তা বলি। গলাকে আমি সেই স্তরে রাখি যে স্তরে কথা শুধু কথার কথা নয়। আমার সচেতন চিন্তায় আমি লক্ষ্যে অবিচল থাকি। নারী যে সব কিছু ধারন করে, তা প্রাগৈতিহাসিক মানুষ বুঝেছিল। ইরাক, মিশর, প্যালেস্টাইন, তুরস্ক, ভারত, পেরু প্রভৃতি দেশের প্রাচীন সভ্যতাগুলো নারীকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দিয়েছিল। মানবজাতির কপালে সেই সুখ বেশি দিন টেকেনি। কোনও এক সামগ্রিকি অসচেতন মুহূর্তে পুরুষ তার বাসনার সর্বগ্রাসী লিপ্সার কাছে ক্রুদ্ধভাবে আত্মসমর্পণ করে। সে-বিষে জর্জরিত মস্তিষ্কের কামড়ের কাছে সে পরাজিত হয়। তখন সে নারীকে বন্দি করার নানান ফন্দি আবিষ্কার করে। আজকের পৃথিবীতে নারী-পুরুষের দাম্পত্য অর্থপূর্ণ করতে হলে এ লড়াই সম্পর্কে শুধু জ্ঞান থাকলেই চলবে না, এই বিবর্তনের বাঁকে বাঁকে দুই পক্ষ যতগুলো ভুল করেছে, সেগুলো সংশোধন করতে হবে। তবেই শুধু সম্ভব দু'টি মানব-মানবীর সুখের সম্পর্ক রচনা করা। সেই কাজ করার ধৈর্য আমার আছে। আর রেণুর ধৈর্যের তুলনাতো পুঁথি-পুরানেও নাই।

আমি পায়ের নিচে মাটি অনুভব করি, আর বলি, "রেণু, কথা বলো।"

রেণু কথা বলে না, কিন্তু মুখ তুলে আমার দিকে চায়। আমি দেখি ওর চিবুক শিথিল হয়েছে। যেন আগুনে জল পড়েছে। উত্তাপ কমে এসেছে। মনে হলো এমন মনোযোগ দিয়ে ও আগে আমাকে কখনও দেখেনি। আমি ওর কপোলের আভা আর চোখের দ্যুতি দেখতে পাই। এ জীবনে আমি আরও একবার প্রমাণ পাই, সচেতনতাই সকল শক্তির আধার।

আমার চোখ দুটি ঝাপসা হয়ে আসে। আহা, এক বিন্দু অশ্রু বুকটাকে যত হালকা করতে পারে, শত-সহস্র নিশ্বাস তা পারে না।

"জানো রেণু?" আমি বলি। "যে মানুষ তোমার সামনে কাঁদবে, সে তোমাকে কখনও কষ্ট দিতে পারবে না।"

আমি চশমা খুলে পাঞ্জাবির হাতাতে চোখ মুছি। মাথাটা একটু নামিয়ে রেণু আমাকে জানায়, ও বুঝেছে।

রেণুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমারও মাথা নত হয়। আজকের দিনটা কীভাবে রেণুর স্মরণে থাকবে, আমি সেই কল্পনা করি। দশ কি বিশ বছর পরে রেণু নিশ্চয়ই বিষয়টা মূল্যায়ন করবে। আর দেখবে কীভাবে আমি প্রতিরোধের আবেগ ঝেড়ে ফেলে গ্রহণের পথে দুই হাত প্রসারিত করেছিলাম।

গরু জবাই হচ্ছে। কালো গরুটার কাটা গলা থেকে লাল রক্তের ফোয়ারা ছুটে আসে। আমি চোখ ফিরিয়ে নিই। আর এক দিকে এক জন লুঙ্গির কাছা মেরে একটা জবাই করা খাশির রাঙের গোড়া চ্যাপটা একটা ছুরি দিয়ে কাটে। কয়েক বার আঘাতের পর খাশির রানটা আলাদা হয়ে যায়। আমি কাটা অংশের এক মাথায় হাড়ের ছোট ছোট সাদা ফালি দেখি। একজন ধুতি পরা মধ্যবয়সী লোক অন্য একটা খাশির চামড়া খালায়।

আমার খারাপ লাগে। জীবনের এই এক নিষ্ঠুর নিয়ম। প্রাণ খেয়ে প্রাণ বেঁচে থাকে। যখন ব্রতচার করতাম, তখন কিছু দিন প্রাণির মাংস খাওয়া থেকে বিরত ছিলাম। তারপর ভেবে দেখলাম, আমি খাই বা না খাই, তাতে একটা প্রাণিরও কোনও উপকার আমি করতে পারব না। প্রাণ খেয়ে প্রাণের বেঁচে থাকা প্রকৃতির নিয়ম। একদিন এই নিষ্ঠুরতা বন্ধের কোনও আয়োজন হলেও হতে পারে। তবে তা আমার বা আমার পরবর্তী জেনারেশনের সময় হবে না। তা ছাড়া আমরা কীভাবে বৃক্ষ আর প্রাণিকে বাঁচাব, যেখানে মানুষকেই আমরা বাঁচাতে পারি না। পৃথিবীতে বিরাজমান অন্যায়তো একটা বা দুইটা নয়। মানব- বা প্রাণি-জীবনে নিষ্ঠুরতার কোনও সীমা নেই। যাঁরা দৃষ্টির বাইরে, চেতনার বাইরে, তাঁদের কথা কি আমরা ভাবি? তাঁদের দুঃখ-কষ্ট আমাদের কতটা স্পর্শ করে? গাত্রবর্ণ, ভাষা, বিশ্বাসের পার্থক্যের উপর মানুষের মায়া নির্ভরশীল। এসব অবিচার মেনে নেয়া যায় না। আবার হতাশায় হাল ছেড়ে দেয়াটাও কাপুরুষতা। আমি যা বিশ্বাস করি তা হলো যতটা সম্ভব, মানুষকে মানবিক করা দরকার। শিক্ষার মধ্য দিয়ে তা সম্ভব। তারও আগে প্রয়োজন মানুষের ভাত-কাপড়ের চাহিদা মেটানো। সেই নগণ্য বিষয়ে কাজ করাই হলো আমার জীবনের উদ্দেশ্য। এটুকু বাসনা নিয়ে নিজেকে মহৎ দাবি করার কোনও সুযোগ নাই। কিন্তু কাজটা যে খুব প্রয়োজন, সে কথাও ভুলতে পারি না।

আমাদের থেকে পঞ্চাশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে আব্বা লাল গামছা পরা লোকটাকে একটা ধমক দেন। কেন তিনি গরুর রক্তের স্রোত আটকাচ্ছেন না। "একটা ফোঁটাও যেন খাশিটার উপর না পড়ে," আব্বা বলেন। "কয়বার বললাম দুই পশুর মাংস তফাতে রাখতে?"

হিন্দুরা গরু খান না। আব্বা চান তাঁরা যেন গরুর মাংসের গন্ধও না পান। আর সেই জন্য কালো-মোটা একটা শামিয়ানা টাঙানো হচ্ছে। আমাদের চোখের সামনে শামিয়ানাটা উঠে যাচ্ছে। এক প্রান্তে একজন কাছা মেরে বাঁশের মইয়ের উপর উঠে শামিয়ানার প্রান্তটা বাঁধছেন, একজন মইটা ধরে আছেন। ওঁদের দিকে তাকিয়ে বোঝা যায় মাছমাংসের ঝোলের কথা চিন্তা করে ওঁরা কয়েক দিন পার করে দিতে পারেন।

এত দিন তাঁরা কাজ করেছেন ধীরে ধীরে। কিন্তু আজ সব কিছু দ্রুত হয়ে যাচ্ছে। অনেকে জুমার নামাজের কথাটাও মনে রেখেছেন। গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলের কয়েকজন শিক্ষকসহ প্রায় জনা বিশেক খ্রিস্টানকেও দাওয়াত দেয়া হয়েছে। অল্প কয়েকজন আসতে রাজি হয়েছেন। তবে তাঁরা কিছু খাবেন না। পাদ্রিরা আজকে রোজা রেখেছেন। আজ তাঁদের গুড ফ্রাইডে।

দরিদ্র লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে আমার ছোটবেলার ছাতা বিলানোর কথা মনে পড়ে। আমি যে বছর প্রথম স্কুলে যাই সে বছর ব্যাপারটা আমার নজরে আসে। বৃষ্টির দিনে বেশির ভাগ ছেলে বৃষ্টিতে ভিজে বুকে বই জড়িয়ে স্কুলে আসে। রোদ উঠলে ওরা বারান্দায় এসে বইগুলো সূর্যের দিকে মেলে ধরে। ওই দৃশ্য করুণ। মাস্টাররাও ওদের কিছু বলতেন না। কারণ সবাই জানতেন শ্রেণিকক্ষে পাঠ গ্রহণ করার চেয়ে ছেলেগুলোর কাছে বই শুকানোর প্রয়োজনীয়তাটা অনেক বেশি। মধুমতি আর বাইগার পাড়ের বৃষ্টির হুল যে না খেয়েছে সে তার তীব্রতা বুঝবে না।

স্কুল জীবনের দ্বিতীয় বর্ষায় আমি কিছু ছেলেকে পর্যবেক্ষণে রাখি। আমি দেখি ওরা ভেজা কাপড় নিয়ে ঘরে ঢুকে ভেজা কাপড়েই থাকে কারণ তাদের বদলানোর মতো কাপড় ছিল না। আমি তাদেরকে একটি করে ছাতা দিতে থাকি। আর এটা দেখে আমার খুব ভালো লাগে যে আমার দেয়া ছাতা মাথায় দিয়ে ওরা শুকনো কাপড়ে ঘরে ফিরতে পারে। তার পরের বছর আমি ছাতার আরও ব্যবহার দেখি। ওদের অনেকের ঘরের চালে অনেক ফুটো ছিল। বৃষ্টি এলে ওরা আমার দেয়া ছাতা মাথায় দিয়ে মা-ছেলে-মেয়ে ঘরের ভেতর ছাতার নিচে গিয়ে দাঁড়াতেন। কিংবা বৃষ্টির সময় ওই আতপত্রের সুরক্ষার নিচে দাঁড়িয়ে কোনও ছেলের মা রান্না করতেন, রান্না করা বলতে ভাত সেদ্ধ আর শাক সেদ্ধ। রাস্তা থেকে তুলে আনা শাক। ছেলেটার বাপ কাঁচা মরিচ দিয়ে দিয়ে ভাত

মাখছেন আর ছেলেটা আমার দেয়া ছাতা দিয়ে পিতাকে ঘরের চাল থেকে পড়া বৃষ্টির পানি থেকে রক্ষা করে চলেছে। আমি বৃষ্টিতে ভিজে এসব দেখেছি। যত দেখেছি, তত আমার চোখ ভিজেছে। আর মানুষকে সাহায্য করার জন্য আমার হৃদয় ব্যাকুল হয়েছে। ফলে আমি আরও বেশি করে ছাতা পরিবেশন করতে থাকি। তাই আমাদের ঘরে কোনও ছাতা বেশি দিন থাকত না। আবার কখনও ছাতার অভাবও হতো না। আমি অবাক হতাম। কোথা থেকে এত ছাতা আসে?

এক দিন দেখি আব্বা গোপালগঞ্জ থেকে বাড়ি এসে আম্মার কাছে একটা গাঁট দেন। খবরের কাগজে মোড়ানো। কিছু সময় পর আব্বা হাত-মুখ ধুয়ে পাকঘরে পাটির উপর বসেন। আমি দরজার আড়াল থেকে আম্মা আব্বার কথা শুনি। আম্মা বলেন, "কয়টা?" আব্বা বলেন, "কুড়িটা। সায়েরা খাতুন, একটা দুইটা করে বের কোরো। যদি আমার ভাইবোনদের সাহায্য করতে না হতো, আমি একশটা ছাতা নিয়ে আসতাম।"

আমি এক লাফে ঘরে না ঢুকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তাঁদের কথা শুনি। আমি বুঝে যাই ছাতার রহস্য। আব্বা নিজে কখনও আমাকে বুঝতে দেননি কীভাবে তাঁর কেনা ছাতায় গ্রামের বাসিন্দারা নিজেদের বৃষ্টি থেকে রক্ষা করে চলেছেন। সে-রাতে আব্বা আম্মার মাঝখানে ঘুমাতে গিয়ে যখন আব্বার গলা জড়িয়ে ধরি, তখন আমার দুই ফোঁটা নীরব অশ্রু আব্বার গেঞ্জি শুষে নেয়। আব্বা বুঝতে পেরেছিলেন কি না, জানি না। তবে তাঁর বাম হাতের বাঁধন আমার পিঠের উপর নিবিড় হয়ে উঠেছিল।

শুধু আমার আব্বাই আমার উপদ্রব মেনে নিতেন, এমন নয়। আমার আম্মাও আব্বার দলেই ছিলেন। তখন আমার বয়স নয় বছর। এক শীতের বিকালে স্কুল থেকে হাঁটা পথে বাড়ি ফিরছি। বাইরে কনকনে ঠান্ডা আর হিমশীতল বাতাস। কুয়াশার কারণে দশ হাত দূরের কিছু ভালো করে ঠাহর করা কঠিন। আমি আমার সামনে একটা কালো পিঠ দেখি। আমি ভাবি কার পিঠ, কেন দেখা যায়? এই শীতের মধ্যে। আমি একটু জোরে পা চালাই। কাছে এসে দেখি ছেলেটা আমাদের গ্রামের জব্বর। বয়সে আমার থেকে বড় কিন্তু লম্বায় আমার তিন ভাগের দুই ভাগ। তারপর পুরো বিষয়টা বুঝতে পারি। জব্বরের পরনের শার্টটার রং এক সময় সাদা ছিল। কিন্তু এখন তার রং ধূসর। শার্টটার পিঠ আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত ছেঁড়া। বাতাসের বাড়িতে ওটার দুই অংশ দুই বিপরীত দিকে ছড়িয়ে আছে।

এতে অবশ্য অবাক হওয়ার কিছু ছিল না। তত দিনে আমি জেনে গেছি আমাদের গ্রামের বেশির ভাগ মানুষ ছেঁড়া গেঞ্জি, ছেঁড়া শার্ট, ছেঁড়া লুঙ্গি, ছেঁড়া ধুতি পরেন। তাঁদের হাতে পয়সা থাকে না সময় মতো কাপড় কেনার। যাঁরা

একটু সৌখিনতা করে জুতা বা সেন্ডেল পরতে চান তাঁদের অবস্থা আরও করুণ। ওইসব জুতা সেন্ডেলের তালির সংখ্যা গুনে শেষ করা যেত না। আমি যখন জব্বরের কাছে যাই তখন নরেশ স্যারের কথা মনে আসে। একদিন দেখি নরেশ স্যার বৃষ্টির মধ্যে খালি পায়ে স্কুলে ঢুকছেন আর তাঁর বগলে প্লাস্টিক দিয়ে মোড়ানো কিছু একটা ধরে রাখা। একটু পর নরেশ স্যার যখন ক্লাশে ঢুকলেন তখন তাঁর পায়ে কয়েকটা তালি দেয়া পরিষ্কার জুতা। স্যারের জুতা কাদামুক্ত রাখার ওই প্রাণান্ত চেষ্টার কথা আমি জীবনে কখনও ভুলব না।

আমি জব্বরের পিছু নিই। লোকালয়ের বাইরে গিয়ে আমি ডাকি:

"জব্বর!"

জব্বর পিছন ফিরে চায়। আমি জব্বরের কাছে যাই। দেখি ওর চোয়াল দুটি শীতে কাঁপছে। ছেঁড়া শার্ট পরে জব্বর আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আর আমি পরে আছি গেঞ্জি, গেঞ্জির উপর শার্ট, শার্টের উপর জাম্পার, জাম্পারের উপর চাদর, যা আম্মা আমার শরীরে জড়িয়ে দিয়েছিলেন। জব্বরকে ডেকে বটগাছের আড়ালে নিয়ে যাই। জব্বর আমার ছাতা পেয়েছিল এক দিন। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে জব্বরের চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আমারও ওর প্রতি মায়া হয়। আমি আমার জাম্পার, শার্ট আর গেঞ্জিটা খুলে জব্বরকে পরতে বলি। জব্বর ওর ছেঁড়া শার্টটা খুলে ফেলে। আমি ভেবেছিলাম ও ভালো জামা পেয়ে ওর ছেঁড়া জামাটা ছুঁড়ে ফেলে দিবে। তা না করে জব্বর ওটা যত্ন করে বটগাছের একটা খাঁজের মধ্যে গুঁজে রাখে। জব্বর একে একে আমার গেঞ্জি, আমার শার্ট আর আমার জাম্পার পরে। কিন্তু কোনও কথা বলে না। আমার শার্টটা ওর হাঁটু পর্যন্ত নেমে এসেছে, তাতে জব্বরের ভ্রুক্ষেপ নাই। বরং আমি দেখি ওর চোয়ালের কাঁপন শান্ত হয়ে এসেছে। তারপর দেখি জব্বরের চোখে জল। যখন জব্বর ওর ছেঁড়া শার্টটা বগল-দাবা করে সঙ্কুচিত হয়ে দ্রুত বটতলা ত্যাগ করে, তখন আমার চোখেও জল এসেছিল।

সে দিন গায়ে শুধু শালটা জড়িয়ে আমি বাড়ি ফিরি। বাড়ির ঘাটায় এসে দেখি দূরে আমগাছের নিচে আম্মা আমার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। গায়ে শাল পেঁচানো অবস্থায় আম্মার মুখোমুখি হতে আমার খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। কিন্তু নিমেষে দেখি আম্মা ওখানে নাই। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। দ্রুত পা চালিয়ে ঘরের দিকে যাই। পরে আমি বুঝতে পারি, আমাকে ওই অবস্থায় দেখে আম্মা নিজেই আম আর সুপারি গাছের আড়ালে চলে গিয়েছিলেন। ভান করেছিলেন যেন আমাকে তিনি দেখতে পাননি। অন্য দিন হলে আম্মা দৌড়ে এসে আমাকে আলিঙ্গন করতেন। সে দিন আম্মা আমাকে আলিঙ্গন করেছেন ঠিকই,

যখন আমি ঘরে ঢুকে আর একটা শার্ট আর জাম্পার পরেছি।

গোপালগঞ্জে এসেও আমি এমন অনেক ঘটনা ঘটিয়েছি। অনেক সময় ভাবি আমি যদি পৃথিবীর তাবৎ টাকা-কড়ি, শস্য, পশু-পাখি, লেপ-তোষক, ইট-কাঠ, ফুল-ফল ইত্যাদির মালিক হতাম, আমি এক এক করে সব গরিব মানুষকে দিতাম। ওদের সুখের কান্নায় আমি শরিক হতাম আর নির্মল আনন্দ আমার দেহে ছড়িয়ে পড়ত। ওদের চালে ফুটা নাই, ওদের দুইটা করে জামা আছে, মহিলাদের দুইটা শাড়ি, দুইটা ব্লাউজ, দুইটা শায়া আছে, ওদের ঘরে চাল আর আলু আর ডাল আর মরিচ আর পেঁয়াজ আর সরিষার তেলের কোনও অভাব নাই, আমার কাজের পরিণতি যদি এটা হতো, আমার জীবন ধন্য হয়ে যেত।

পাতিল-চামচের টুংটাং, ঢুংঢাং শব্দ হয়। ঠশ্ করে চুলায় জ্বলন্ত বাঁশের গিরা ফাটে। তর্ক-বিতর্ক, হাসি-ঠাট্টা, ইত্যাদি শুনে বোঝা যায় উৎসবের আয়োজন অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আমার নাকে মাংসের ঝোলের ঘ্রাণ। বাতাসে ধোঁয়ার ভাপ। রেণুকে দেখে মনে হয়, ও আমার মন ভালো হওয়া খেয়াল করেছে। আর তাতে আমি আমার চোখের চার কোণে ভালো লাগার ছোঁয়া অনুভব করি। মন শান্ত হওয়াতে আমার শরীর আনন্দ উৎপাদন করে। পৃথিবীতে আনন্দের চেয়ে ছোঁয়াচে জিনিস আর কী আছে? রেণুর কটা চোখের উপর থেকে একটা ক্ষীণ ঝিলিক গড়িয়ে পড়ে। আমার আনন্দ আরও বেড়ে যায়। রেণুর বিদ্রোহী দেহকাঠিন্য চলে গেছে। কোমরের উঁচু ঘেরটা ছাড়া ওর শাড়ি পরায় আর কোনও ক্রুটি নাই। আমি পোশাক-আশাকের গুণাগুণ বিচার করি না। তবুও শুধু বাঙালি বলে হয়তো একটা কথা আমার বার বার মনে হয়। পৃথিবীতে শাড়িই হল নারী জন্য সবচেয়ে সুন্দর পোশাক।

অসুখের দিনগুলোতে স্কুলে না গেলেও সঙ্গীত, সাহিত্য, শিল্প, দর্শন এসব পড়েছি। আব্বার রাখা পত্রিকাগুলো আমাকে অনেক তথ্য দিত। আরও পরে বইতে ইউরোপিয়ান পুনর্জাগরণের চিত্রকর্মগুলো খুঁটে খুঁটে দেখেছি। গ্রিক-পুরান কিংবা রামায়ণ আর মহাভারত থেকেও অনেক নারীর কথা জেনেছি। কিন্তু তাদের কাউকে ওই চিত্রকর্মগুলোর মতো চোখ দিয়ে দেখার সুযোগ হয়নি। রেণুকে দেখে আমার অনেকগুলো চিত্রকর্মের কথা মনে আসে। বিশেষ করে জোভানি বুসির রোমান-সেনাপতি থেকে দৈববলে রক্ষা পাওয়া কুমারী আগাথার মুখ। জর্জিয়নির আসিরিয়ান-সেনাপতি-বধকারিনী জুডিথের মুখ। রাফায়েলের রুটি-বেলা গৃহবধু লা ভেলাতার মুখ।

"রেণু, রেণু কোথায়?"

আমি আম্মার ডাক শুনি। আব্বা রেণুকে বউমা বলা শুরু করেছেন আমাদের

সেই ছোট বেলা থেকে। কিন্তু আম্মা তা এখনও করেননি। তা হয়তো কখনও সম্ভবও হবে না। শৈশবে বাবাকে হারানোর পর থেকে রেণু আম্মাকে বাবা বলে ডেকে এসেছে।

"রেণু, ঘরে যাও," আমি বলি।

"আর কিছুক্ষণ থাকি?"

কী যে ভালো লাগল রেণুর কথা! মনে হল আমার ওজনের অর্ধেক এক নিমেষে বাতাসে মিলিয়ে গেল। আরও বেশি ভাল লাগে এই কথা ভেবে যে আমার উপর রেণুর আস্থা অবিচল আছে। মনে মনে আমি রেণুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

"রেণু!" আম্মা আবার ডাকেন।

রেণুর চোখ আমার দিকে চায়। "যাবো?"

রেণুর গলায় উৎকণ্ঠার আভাস? আমি এক কদম এগিয়ে রেণুর আরও কাছে দাঁড়াই। বলি, "যাও।"

"একটা কথা বলি?"

"বলো, রেণু।"

"এত মানুষ দেখে আমার ভয় হচ্ছে।"

"কেন, রেণু?"

"জানি না।"

"কিছু হবে না, রেণু। তুমি দেখো।"

"আপনি সব ভুলে যান।"

আমি কিছু ভুলিনি। কিন্তু সেসব কথা আমি এখন আর রেণুর সামনে তুলতে চাই না। আমি বলি, "রেণু, ভয় পেয়ে আমরা কোনও কিছু থেকে বিরত থাকব না। আমাদেরকে সব কিছু করতে হবে। যদি সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়, করব। কিন্তু ভয় পেয়ে কোনও কাজ পরিত্যাগ করা উচিত নয়।"

"আমি আর একটু থাকতে চাই এখানে," রেণু বলে।

রেণু, তুমি আমৃত্যু থাকো, আমি মনে মনে বলি। যখন সবাই চলে যাবে তখনও তুমি থেকো। তুমি থাকলে আমি নিরাপদ থাকব। আমার বিশ্বাস তোমার চৌহদ্দিতে প্রবেশ করে এমন অশুভ শক্তি পৃথিবীতে নাই।

রেণুর জন্মের পর ওর আব্বা পাঁচ বার আজান দিয়েছিলেন। আমার বয়স তখন দশ। দুই বছর বয়স থেকেই আমার জীবনে ঘটে যাওয়া সব কিছু আমি মনে করতে পারি। এক সময় আমার স্মৃতিশক্তি সর্বসমক্ষে প্রকাশ করতে লজ্জা পেতাম। কারণ কিছু মুরুব্বি বলতেন দুই বছর বয়সের শিশুর কোনও কিছু মনে থাকার কথা নয়। আমার বয়স যখন ছয়, তখন আমি আমার ছোট ফুফাকে বলেছিলাম, ফুফা, আপনি যে পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলেন, সে কথা আমার মনে আছে। ফুফা আমার আব্বার কাছে এসে আমাকে নিয়ে তাঁর উদ্বেগের কথা জানান। আমার ভেতর কোনও জ্বিন-পরি আছে কি না, কারণ আমারতো দুই বছর বয়সের ঘটনা মনে থাকার কথা নয়। ফুফা যখন শ্রাবণ মাসে আমাদের বাড়ির বৃষ্টি-ভেজা উঠানে পড়ে যান, যে কারণে তাঁতে কয়েক মাস বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়েছিল, সে কথা মনে আসলে আজও হাসি চাপা রাখতে পারি না। ফুফা অবশ্য সাথে সাথে উঠে গিয়েছিলেন কিন্তু আমার মেজ চাচির চোখের উপর ওনার চোখ পড়াতে উনি লজ্জা পান। আমার ছোট দাদা খান বাহাদুর আব্দুর রশিদ আমার ফুফাকে তিরস্কার করে বলেছিলেন, দুই বছর বয়সের ঘটনাও মানুষের স্মৃতিতে থাকতে পারে, যদি ঘটনাটা বিশিষ্ট কিছু হয়। কিন্তু ছোট বেলার আরও অনেক সাধারণ ঘটনাও আমার মনে আছে। যেমন মেজ চাচি আমাকে কোলের উপর রেখে ডানে-বামে দুলিয়ে ঘুম পাড়াতেন, এবং তখন আমার বয়স দুই বছরেরও কম ছিল। আমি মনে করি মন নিয়ন্ত্রণ অনুশীলন করাতে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো মনে রাখা আমার জন্য সহজ হয়েছে। রেণুর জন্মের দিন ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো শুধু যে আমার মনে আছে তা নয়, সে দিন আমি ক্ষুদ্র একটা ভুমিকাও রেখেছিলাম।

রেণুর আব্বা শেখ জহুরুল হক আমার আব্বার চাচাত ভাই। প্রথম বার

আজান শেষ করে শেখ জহুরুল হক তাঁর নবজাতিকাকে বুকের আরও কাছে টেনে নেন। তিনি একবার তাকান হলুদ চাদরে বুক পর্যন্ত ঢাকা তাঁর স্ত্রীর দিকে, তারপর আবার নিজের কনুইয়ের উপর শোয়ানো রেণুর দিকে। আশঙ্কায় আমার বুক কাঁপছিল, কারণ আমার মনে হচ্ছিল নড়াচড়ার সময় তিনি তাঁর কন্যার হাত বা পা বা মাথার ক্ষতি করে ফেলবেন। আমি এর আগে কখনও সদ্য ভূমিষ্ঠ হওয়া কোনও শিশুকে দেখিনি, তাই জানা ছিল না, ওরা কত নরম আর ভঙ্গুর হতে পারে। জহুর চাচা কন্যাকে বিছানার উপর নরম তাকিয়ায় হেলান দেয়া তাঁর স্ত্রীর বুকের উপর রাখেন। কাজটা তিনি এমন দক্ষতার সাথে করেন, শিশু রেণুর নিরাপত্তা নির্বিঘ্ন থাকে, আর আমারও রুদ্ধশ্বাস মুক্তি পায়।

নবজাতিকা রেণু মায়ের ছোঁয়ায় কান্না থামায়। রেণুর বোন জিন্নাতকে কোলে নিয়ে আমার আম্মা কাজের মেয়েকে গরম পানি আনতে বলেন। প্রসূতির কোলে রেণুর নরম সাদা শরীর শান্ত হয়ে আসে। নবজাতিকার কান্না থেমে যাওয়ার বিষয়টা যে অনেক গূঢ় কিছু তা অবশ্য বোঝার বয়স তখন আমার ছিল না। আমি শুধু দেখলাম কী করে কন্যার দিকে চেয়ে জন্মদাত্রীর গাল আর কপাল ত্বকের ভেতর থেকে আলোকিত হয়ে ওঠে। ঘামে ভেজা চুলগুলো না দেখলে কেউ বিশ্বাসই করতে পারত না, ওই নারী মাত্র সন্তান প্রসব করেছেন।

আমি বুঝতে পারছিলাম রেণুকে কোলে নিয়ে রেণুর আম্মা মন ভরাতে চাইছিলেন। কিন্তু জহুর চাচার তা সহ্য হচ্ছিল না। তিনি নবজাতিকাকে পুনরায় সযত্নে মাতৃকোল থেকে তাঁর বাহুতে তুলে নেন। আর নবজাতিকার কানে আবার আজান দিতে থাকেন।

আল্লা হু আকবর! আল্লা হু আকবর!

"এক বারের বেশি আজান দেয়ার নিয়ম নাই, বাপ," রেণুর দাদা বলেন। দু'এক জন হাসাহাসিও করেন। কিন্তু জহুরুল হকের তাতে কোনও বিকার নাই। তিনি বলেন, "কী করব, আব্বা? মন চায় শুধু বলি, আল্লাহ সর্বশক্তিমান, আল্লাহ সর্বশক্তিমান।"

কন্যার কানের কাছে মুখ নিয়ে শেখ জহুরুল হক আবার আজান দেন। যখন তিনি পঞ্চম বার আজান দিলেন, তখন আমার খেয়াল হয়, উঠানে ফিসফাস চলছে। আমি কান খাড়া করি। আর কোনও এক পুরুষের কথা স্পষ্ট ভাবে শুনতে পাই। তিনি বলেন, "জহুর শেখ পাগল হয়ে গেছে।"

কথাটা নিশ্চয় জহুর চাচার কানেও যায়। তিনি দরজার কাছে এসে উঠানের দিকে তাকিয়ে বলেন, "হ্যাঁ, পাগল হয়ে গেছি।" জহুর চাচা তাঁর

কন্যার মুখখানা সবার দিকে তুলে ধরেন। "দেখো, আমি পাগল হয়ে গেছি। কেন হব না, বলো? তোমরা কখনও এমন একটা বাচ্চা দেখেছ? এমন সুন্দর নবজাতিকা দেখেছ? এমন চোখ কবে কখনও কোথাও দেখেছ?"

জহুর চাচার চিৎকার শুনে ঘরে আর উঠানে শোরগোল থেমে যায়। মানুষগুলো একে অন্যের দিকে চায়। কিন্তু কেউ কোনও উত্তর দেয় না। তারপর তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে থাকে। আমি সবগুলো কথা ধরতে পারিনি। তবে এটুকু বুঝলাম, তারা কেউ কখনও এমন সুন্দর মানবশিশু দেখেনি। যারা ইংরেজ বা ওলন্দাজ বা পর্তুগিজ শিশুদের দেখেছিল, বা বাপ-দাদা আর নানি-দাদির কাছে ওই-সব শিশুর গল্প শুনেছিল, তারাও বলল, তারা কখনও এমন তুলতুলে ধবধবে গোলাপী-সাদা শিশুমুখ কিংবা এমন ধারালো বাদামী চোখ কখনও দেখেনি, বা এমন শিশুর গল্পও শুনেনি।

তারপর হাওয়া যেন উল্টো দিক থেকে বইতে শুরু করে। উঠানের মানুষগুলো গবেষণা শুরু করেন। সন তারিখ উল্লেখ করে তাঁরা মাথা নাড়েন, হাত নাড়েন, চোখ বড় করে তাকান, আবার একে অন্যকে চোখ মারেন। কখন কোন ইংরেজ কোন রাস্তা দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে এসেছিল, কোথায় এসে নৌকা ভিড়িয়েছিল, কোন জঙ্গলে গিয়ে তলপেট খালি করেছিল, আরও কত কী। মধুমতির নির্মল বাতাসে শরীর জুড়ানোর জন্য এক সময় উঁচু পদের ইংরেজ সাহেবরা নদীটির উপর নৌকায় চড়ে বেড়াতেন। মাছ ধরতেন। "সে সব অনেক আগের কথা," এক জন বলেন। "তাই বলে দুই এক জন কি এখনও আসে না?" দুই নাসারন্ধ্র থেকে দুই গোছা চুল বেরিয়ে আসা এক বয়স্ক লোক এ কথা বলে খেঁকিয়ে উঠেন।

রেণুর এক দূর-সম্পর্কের মামা খেঁকানো লোকটার পিঠের উপর একটা ঘুসি বসিয়ে দেন।

শুধু আমি নই। সবাই স্তম্ভিত হয়ে যায়।

"মুরুব্বির গায়ে হাত!" এক মধ্য বয়সী তাগড়া লোক জ্বলে উঠেন।

"গায়ের জোরে সত্য লুকিয়ে রাখা যাবে না," লাল শার্ট পরা বেঁটে একটা লোক বলেন।

"হাত থাকতে মুখ দিয়ে কথা কেন?" কেউ একজন ভিড়ের ভেতর মুখ লুকিয়ে বলেন।

কয়েক জন বেশ মারমুখী। শুরু হয় হাতাহাতি। আমার এক চাচা আমরা যারা ছোট তাদেরকে একটু তফাতে ঠেলে দিয়ে নিজেই হাত চালাতে শুরু করেন। আমি ভয় পাই না। কিন্তু অন্য শিশুগুলোর চোখমুখ উদ্ভ্রান্ত। তাদের একজন কেঁদে ওঠে। আমি শুধু হাত দেখি। বড়দের হাত। বিদ্যুদ্বেগে চলন্ত

হাত। আমি দেখি মানুষ কত সহজে উত্তেজিত হয়ে যায়। দু-এক জন আহত হাত, আহত ঘাড় ইত্যাদি ঝাড়া দিতে দিতে ভিড় থেকে বের হয়ে আসেন। "জহুর শেখের বিবি তালাক হয়ে গেছে," লুঙ্গি পরা একটা মোটা লোক ভিড়ের মধ্যে চেঁচিয়ে ওঠেন। তাঁর চড়া পিঠে কয়েকটা ঘুসি পড়ে। কিন্তু লোকটার তাতে কোনও বিকার নাই। তিনি আরও বেশি অপমানজনক কথা আরও বেশি গলা চড়িয়ে বলতে থাকেন। এক জনকে নিয়ে ব্যস্ত থাকার মতো আমাদের পক্ষে অত লোক ছিল না। কারণ তখন গোটা টুঙ্গিপাড়া শেখ বাড়িতে তামাসা দেখতে চলে এসেছে। তখন আমার মনে পড়ে আগের দিন রেণুদের ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব কোনের কদম গাছের গোড়ায় আমি একটা বিচ্ছিন্ন খেজুর কাঁটা দেখেছিলাম। আল্লাহ আল্লাহ করে আমি গাছটার গোড়ায় যাই। আর দেখি কাঁটাটা বেশ নিরাপদেই শুয়ে আছে। বৃষ্টি-বিধৌত তাগড়া খেজুর কাঁটা, আর লাল টকটকে হুল। আমি কাঁটাটা তুলে নিয়ে আমার পাজামার পকেটে ঢুকাই। সাবধান ছিলাম যাতে নিজে ঘা না খাই। তারপর খুব দ্রুত আমি ভিড়ের মধ্যে ঢুকে যাই, কাঁটাটা পকেট থেকে বের করে মোটা লোকটার ভারী নিতম্বে জোরে একটা খোঁচা দিয়ে আবার দ্রুত ফিরে এসে শিশুদের লাইনে দাঁড়াই। আমার শরীরটা চিকন হওয়াতে কাজটা শেষ করে নিরপদে ফিরে আসতে কোনও অসুবিধা হয়নি। যখন আমি কাঁটাটা যথাস্থানে রেখে ফিরে আসি, তখন দেখি ডান হাত দিয়ে আহত স্থানটা ডলতে ডলতে আর গালি দিতে দিতে লুঙ্গি পরা মোটা লোকটা উঠান ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন।

কয়েকজন মুরুব্বি অনেক কষ্টে কলহরত মানুষগুলোকে থামান। তারপর অনেক আলোচনা করে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, রেণুর আম্মা কখনও কোনও ইংরেজ বা ওলন্দাজ বা পর্তুগিজ দেখেননি। আর তিনি বাড়ির বাইরেও কখনও যাননি। ইংরেজরা ওলন্দাজ আর পর্তুগিজদের কান ধরে ভারতবর্ষের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন অনেক আগে। তারপর স্বদেশী আন্দোলন শুরু হওয়ার পর ইংরেজদেরও কলিজায় ভয় ঢুকে গেছে।

"এই সময়ে কোনও ইংরেজ শেখ গোষ্ঠীর কারও ছায়া মাড়াবে এটা তোমাদের মাথায় এল কী করে?" সাদা পাঞ্জাবি পরা এক বৃদ্ধ বলেন।

"সে কথা মানলাম, কিন্তু নিজের চোখে যে দেখলাম," গলায় গামছা পরা ভদ্রলোক গোছের আর এক বৃদ্ধ বলেন।

"কী?" একজন বলেন।

"আপনে নিজে দেখেছেন?" আর একজন বলেন।

"দেখেছি।"

"কী দেখছ এখনই বল। দেশে সমাজ আছে।"

রেণুর মামা গলায় গামছা জড়ানো বৃদ্ধের ঘাড় চেপে ধরেন। "কী দেখেছেন বলেন? বলতে না পারলে আপনাকে আমি বাইগারে ছুঁড়ে ফেলে দিব আর উঠতে দিব না।"

"কী দেখেছো, কখন দেখেছো?"

রেণুর মামা বৃদ্ধ লোকটাকে ঘাড় ধরে ঝাঁকাতে থাকেন।

"কি দেখেছেন বলেন?"

"ওই যে জহুর শেখের মেয়েটা," বৃদ্ধ বলেন।

সে দিন এ ভাবে এই সন্দেহ দূরীভূত আর এই বিবাদের মীমাংসা হয়েছিল। তাঁরা বুঝলেন তাঁদের বিহ্বলতা কোনও ইংরেজের দুষ্কর্মের ফল নয়, তার একমাত্র কারণ ওই নবজাতিকা নিজেই। তখন তাঁরা এক বার রেণুর আব্বার দিকে চান, আর এক বার রেণুর আম্মার দিকে। তাঁরা রেণুর দাদার দিকে চান। এক জন তাঁর পূর্বপুরুষদের থেকে শোনা শেখ বোরহানউদ্দিনের কথা বলেন। তাঁরা শেখ কুদরতউল্লাহ আর শেখ কেরামতউল্লাহর কথা বলেন। তাঁরা শেখ গোষ্ঠীর মেয়েদের কথা বলেন। এখন তাঁরা উল্টো কথা বলতে থাকেন। এক সময় শেখদের গায়ের রং নাকি ফিরিঙ্গিদের গায়ের রঙের চেয়ে ফর্সা ছিল আর তাদের চামড়া ইংরেজদের চামড়ার মতো খসখসে ছিল না। "মোলায়েম ছিল, মোলায়েম।"

"ঠিক জহুর শেখের মেয়ের মতো," এক জন যোগ করেন।

তারপর তারা লাইন ধরে আর এক বার শিশু রেণুকে দেখেন। আমি আমার আব্বার মধ্যে স্বস্তি দেখতে পাই। কোলাহল থেমে যাওয়ার দরকার ছিল। কারণ তখনও রেণুকে শাল-দুধ খাওয়ানো হয়নি। আমার আম্মা আর এক চাচি সেই ব্যবস্থা করার জন্য ঘর থেকে সব পুরুষ মানুষকে বের করে দেন।

উঠানের মানুষগুলো নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন। তাঁরা ফোরাত নদীর তীরের আর্য রক্তের কথা বলেন। তাঁরা জানেন তাঁদের পূর্বপুরুষরা সবাই শেখ গোষ্ঠীর নুন খেয়ে জীবন ধারন করা মানুষ।

নবজাতিকা রেণুকে নিয়ে সর্বসাধারণের গর্ব হয়। আকাশে ঘন মেঘ ছিল। এরপর এমন বৃষ্টি আসে আমার মনে হলো প্রতিটা ফোঁটাই বুঝি খেজুর কাঁটার হুল। বাড়ি যাওয়ার আগে হিন্দু-মুসলমান সবাই বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে রেণুর সুখের জন্য দোয়া করেন। তাঁদের বাসনা, রেণু যেন একদিন রানি হয়ে কোনও সিংহাসন উজ্জ্বল করে। তাঁরা বলেন এমন শিশুর রানির নিচের কোনও পদ দখল করা মানে তাঁর সৌন্দর্যের অপমান। তারপর কয়েক

মাস ধরে গ্রামগ্রামান্তর থেকে মানুষ এল রেণুকে দেখতে। এমনকি মধুমতির ওপার থেকেও অনেক মানুষ এল। সবার মুখে এক কথা। রেণু যেন এক দিন রানি হয়।

আজকে যখন এ সব কথা স্মরণ করছি, তখন আমার বুকে একটা ভিন্ন রকমের ব্যথা বরফের টুকরার মতো জমা হয়। রেণুকে সবাই রানি হিসাবে দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কেউ ভাবলেন না, রাজা আসবে কোথা থেকে। আমি রাজা নই, কোনও দিন হবোও না। রেণুর কোনও দিন রানি হতে পারবে না।

রেণু আমার আরও কাছে এসে দাঁড়ায়। মনে মনে বলি, রেণু, তুমি রানি হবে না। তবে সুখী হবে। আমি তার ভার নিলাম। তা ছাড়া রানিরা সুখী হয় এমনটা আমার জানা নাই। উপপত্নীতে আসক্ত নয় এমন রাজার নাম শুনেছি বলেতো মনে হয় না।

রেণুর আব্বা সরকারি চাকরি করতেন। তখন তিনি যশোরে কো-অপারেটিভ সোসাইটির ইন্সপেক্টর ছিলেন। তিনি সাপ্তাহিক ছুটিতে মাসে চার দিন বাড়ি থাকতেন। ওই চার দিন শেখ জহুরুল হকের দুই বাহুতে তাঁর দুই মেয়ে ঝুলত। রাতে রেণু তার বাবার বুকের উপর ঘুমাতো। আম্মার মুখে শুনেছি, রেণু তার বাবার প্রতি যে রকম অনুরক্ত ছিল সে রকম অনুরাগ আর কখনও কোথাও কোনও ছোট্ট শিশু তার পিতার প্রতি দেখাতে পারেনি।

মাত্র তিন দিনের কলেরায় জহুর চাচা তাঁর কর্মস্থল যশোরে মৃত্যু বরণ করেন। যশোরেই তাঁকে কবর দেয়া হয়। রেণুর বয়স তখন তিন। রেণু আর কখনও তার বাবাকে দেখেনি। তবে তখন থেকে যতবার রেণুদের বাড়ির দরজায় কেউ টোকা দিয়েছে কিংবা দরজাটা খোলা হয়েছে, ততবার রেণু ছুটে গেছে দরজার সামনে। ওই সময়গুলোতে নাতনির দুঃখ ভরা মুখ দেখে রেণুর দাদা শেখ আবুল কাশেমকে আমি কাঁদতে দেখেছি।

সাত বছর বয়সের মধ্যে সব আপনজনকে হারালেও ছোট্ট রেণুর অন্তর জুড়ে ছিল শুধু ওর বাবা। আমাদের ঘরে এসে রেণু দেখল, আমাদের ভাইবোনদের আব্বা আছেন। আমরা তাঁকে ভালোবাসি। আব্বা আব্বা বলে দূর থেকে চিৎকার করে ডাকি। একদিন রেণু ফুঁপিয়ে ওঠে। "আমি কাকে আব্বা বলে ডাকব?"

"আমাকে।" সে দিন আমার আম্মা বলেছিলেন।

তখন থেকে আমার আম্মা হয়ে গেলেন রেণুর মা ও বাবা দুটোই। রেণুর সাথে আমার আম্মার যে অন্তরঙ্গতা তা দুটি মানুষের ক্ষেত্রে কদাচ দেখা যায়। সেই রেণু আজ তার দত্তক পিতার ডাকে সাড়া দিতে সঙ্কোচ করছে। আমার তা ভালো লাগছে যদিও। একই সাথে আমাকে তা আমার দায়িত্বের কথাও মনে করিয়ে দিচ্ছে। আমি নিজেকে বলি, রেণুকে দেখে অনেক কিছু শেখার আছে।

"কি রে, আব্বা?" আম্মা এসে তাঁর কর্মঠ সাদা হাত রেণুর ঘাড়ে রাখেন।

আমার আম্মার বয়স এখন ছাপ্পান্ন। আব্বার মতো আম্মাও মাশাল্লাহ অনেক সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। আর অনেক সুন্দরী আমার আম্মা।

আম্মা রেণুর হাত ধরে রেণুকে ঘরে নিয়ে যান।

ব্যাপারটা ভালো হয়েছে। এতক্ষণ যাঁরা আমাদের দেখেছেন তাঁরা সবাই আমাদের পরিচিত, আমাদের গ্রামের মানুষ। এখন দুই-একজন অপরিচিত লোক আসতে শুরু করেছেন। রেণু হয়তো তাঁদের দেখে বিব্রত হত। আমি রেণুর হাঁটা দেখি। রেণু আম্মার এত কাছে ঘেঁষে আছে যে দেখতে খুবই ভালো লাগছে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আম্মা পেছনে তাকান।

"খোকা, পাঞ্জাবিটা বদলাও।"

রেণুও আমার দিকে আর এক বার চায়। আমার আর এক বার মনে হয়, হয়তো আমি সব কিছু ভুলে যাব। জরাজীর্ণ দেশের কথা, সাম্প্রদায়িক বিষের কথা, ক্ষুধার্ত মানুষের কথা, নিষ্ঠুর শাসকের কথা। হয়তো আর কখনও বাড়ির বার হব না।

শৈশবে আমার স্বপ্ন ছিল ঘরে থাকা। খালা-ফুফুদের বাড়ি বাড়ি ঘোরা, চাচি-জেঠিদের ঘর থেকে বের না হওয়া। বাড়ির বড় ছেলে ছিলাম বলে সবাই আমাকে কোলে তুলে নিতেন। যখন ফুফু আর চাচিদের কাঁধের পরিধির চেয়ে আমি বড় হয়ে গেলাম, তখনও তারা আমাকে হাতে হাতে রাখতেন।

অনেক অবাক লাগে যখন ভাবি এখন আমি কত কম সময় ঘরে থাকি। কী ভাবে আমার জীবন বদলে গেল। কী ভাবে মা-চাচির কোল ছেড়ে আমি কৃষক-শ্রমিকের বুকে চলে গেলাম। আজ যখন ভাবি সব ছেড়ে দেব। রেণুর আঁচলের নিচে জীবন কাটিয়ে দেব। তখন আমার পাঁচ বছর বয়সে দেখা সেই ঘটনা মনে পড়ে, যার জের আমার জীবনে কোনও দিন কাটবে বলে মনে হয় না। পরাধীন দেশে কোনও যুবকের ঘরে বসে থাকা শোভা পায় না। পরাধীনতার দুঃখ ভুক্তভোগী ছাড়া কে জানে? আমি তা জেনেছিলাম সেই পাঁচ বছর বয়সে।

আমার শৈশবের সে-দিন আব্বা গোপালগঞ্জ যাবার জন্য প্রস্তুত। দুপুর বারোটা। বাইগার এর বাতাসে পাহাড়ি পলির গন্ধ, স্রোতে বর্ষার বান। আম্মা আর আমি আব্বাকে বিদায় দিতে এসেছি। মাঝি নৌকার মাঝখানে আব্বার বিছানাটা ঠিক করছেন। আকাশে চিল ওড়ে। দূরে চরের বুকে দু'টা বক এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। বৃষ্টি-ধৌত হিজলের পাতার উপর সূর্যের ঝিলিক। আমি আমার শিশু ত্বকের উপর আষাঢ় মাসের গরম হাওয়া অনুভব করি। দুই দিন ধরে বৃষ্টি নেই। দিগন্ত জুড়ে সাদা মেঘ।

এমন সময় একটা গরুর গাড়ি সেই আগন্তককে নিয়ে আসে। চার জন খাকি রঙের ইউনিফর্ম পরা লোক গাড়িটাকে অনুসরণ করেন। আমি গরুর গাড়িতে চড়া লোকটার গোঁফ দেখি: লাল। ত্বক দেখি: সাদা। পাটের খড়ির বেড়ার মতো হলুদ দাঁতের মাড়ি দেখি। লিকলিকে হালকা আর খাটো একটা

মানুষ। ঘাড় কাত করে আমি তার মুখ দেখি। তখন বুঝিনি। পরে বুঝেছি। তিনি ছিলেন এক ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট। সাহেবের পেছনে গাড়িতে দুজন স্বদেশী লোক পড়ে আছেন। ওঁদের হাত-পা পাটের কাঁচা দড়ি দিয়ে বাঁধা, এমন দড়ি যা ঘরে পাকানো হয়। দুই বন্দির একজনের গা খালি এবং পরনে একটা ধূসর রঙের প্যান্ট। তাঁর গলা দিয়ে গড়গড় শব্দ বের হয়। আমি তাঁর বাহুতে বেতের বাড়ির দাগ দেখি। আন্য লোকটা একটা কালো প্যান্ট আর কালো শার্ট পরা।

কালো পোশাক পরা বন্দি লোকটা অপলক চোখে আকাশের দিকে চেয়ে আছেন। তারপর যা দেখলাম তাতে আমার ভেতর থেকে ঘামের একটা ক্ষীণ ধারা এক সাথে বের হয়ে আসে। কালো পোশাক পরা লোকটার বাম দিকের প্যান্টে একটা ছিদ্র, উরুর মধ্যে একটা গোল ঘা, আর তা দিয়ে রক্ত তিনদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছিল। পরে বুঝেছি, লোকটাকে গুলি করা হয়েছিল। কিন্তু লোকটা এক মনে আকাশ দেখে যাচ্ছেন। যেন তিনি গুলির আঘাতের যন্ত্রণাকেও তাঁর আকাশ-দর্শনের সাথে এক সূত্রে গেঁথে নিয়েছেন। দৃশ্যটা আমার চোখের উপর এখনও জাজ্বল্যমান। এখনও আমি দিব্য চোখে দেখতে পাই সে বিপ্লবী কীভাবে তাঁর দেহের যন্ত্রণাকে আপন করে নিয়ে মনকে শান্তিপূর্ণ রেখেছিলেন। যেন শুধু চোখ দিয়ে নয়, তিনি তাঁর সারা শরীর দিয়ে আকাশ দেখছেন। সে দিনের সে পরম অনুভূতি আমার মগজে গেঁথে গেছে। সে দিন জীবনে প্রথম আমি দেখেছিলাম, কীভাবে মনের সাথে দেহের সংযোগ ঘটাতে হয়। পরবর্তীকালে যে শিক্ষা আমার পূর্ণ হয়েছিল হামিদ মাস্টারের প্রভাবে আর ব্রতচারের দিনগুলোতে।

আমার জীবনের প্রথম হিরো ছিলেন অচেনা সেই আহত বিপ্লবী। জীবনে আমি যে কাজ বেছে নিয়েছি, সে কাজে ব্যাপৃত থাকা অবস্থায় গুলি খেয়ে কিংবা তলোয়ারের আঘাতে আমার মৃত্যু হতে পারে। যখন থেকে দেশ স্বাধীন করার জন্য ঘরের বার হলাম, তখন থেকে নিজেকে বার বার বলেছি, যদি কখনও গুলি খাই, তখন ব্যথাটাকে সেই বিপ্লবীর মতো আপন করে নেব। যখন জেনে যাব যেতে হবে, তখন মৃত্যুটাকে আপন করে নেব। অনেক বছর পর যখন একরাত অচেতন থেকে মৃত্যুভয় থেকে চিরতরের জন্য রেহাই পেলাম, তখন এই বিশ্বাস আমার চলে এল, আমি আমার শেষ নিশ্বাস সচেতনভাবেই ত্যাগ করব।

পাঁচ বছর বয়সে দেখা সেই ঘটনা আমি প্রায়ই স্মরণ করি। স্মরণ করি সে দিনের সেই খলনায়ক ইংরেজটাকেও। যিনি দাঁত কড়মড় করে শব্দরত বিপ্লবীটার দিকে চান আর আঙ্গুল তাক করে বলেন, "হামি হোর হাওয়াঝ শহ্য

খরতে ফারছি না।"

তাঁর কথা শুনে আমার খুব কৌতূক-বোধ হয়েছিল। তার চেয়েও বেশি হয়েছিল ভয়। আম্মা আমার কম্পনরত শরীরটাকে বুকে জড়িয়ে রাখেন। গরুর গাড়ির পেছনে হেঁটে আসা চারজন বাঙালি ছিলেন বিভিন্ন বয়সের আর রঙের আর উচ্চতার। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে মোটা যিনি তিনি একটা গামছা দিয়ে ধূসর রঙের প্যান্ট পরা বিপ্লবীটার মুখ বেঁধে দেন। বাঁধাইয়ের কাজ শেষ করে তিনি আমাদের দিকে তাকান। তাঁর খাকি রঙের শার্টের পেটের একটা বোতাম খুলে ছিল। চর্বির চাপে। ইউনিফর্মের ভেতরে ঘামে ভেজা ময়লা গেঞ্জি নাভির গর্তের মুখে চোঙার আকার ধারণ করেছিল। আমি লোকটা থেকে চোখ ফিরিয়ে নিই আর শব্দরত বিপ্লবীটাকে দেখি। মুখ আটকানোর পর তাঁর গোঙ্গানি বেড়ে গেছে। অন্য বিপ্লবীর প্রান্তে গরুর গাড়ির কাঠের পাটাতন থেকে এক ফোঁটা রক্ত টপ করে ঘাসের উপর পড়ে।

"মিস্টার লুটফর," ইংরেজ সাহেব আব্বাকে বলেন। "এই ধুইটাকে আমি গবার্নর এর খাছে ফাঠাবো।"

"মুখটা খুলে দেওয়া যায় না?" আব্বা বলেন। "ও তো পালাতে পারবে না।"

"মিস্টার লুটফর, আমি থোমাকে হেত ধিন ঘৃণা করতাম, আজকে থোমাকে ফছন্দ খরলাম," সাহেব বলেন।

"কেন? কী হয়েছে, স্যার?"

"থোমাকে ঘৃণা খরেছি খারন থোমার ফ্রপিতামহ খোদু শেখ আমার ফ্রপিতামহ মিস্টার রাইনকে ইংরেজদের খাছে হফমান খরেছিল। হেত অফমান খরেছিল যে শে ইংলন্ডে ছলে ঘিয়েছিল। হাজ থোমাকে ফছন্দ খরলাম, খারন থুমি এই শব সন্ত্রাসিদের সম্বন্ধে খিচ্ছু ঝানো না। হেদের খাউকেই আমরা ভেঁধে রেখেও ধরে রাখতে ফারি না। এরা খী খায়দায় ফালায় শেটা নিয়ে রাজার ফার্লামেন্টে হালোচনা হয়। ঘোয়েন্দা আর হপরাধ ভিজ্ঞানিরা হেদের নিয়ে ঘবেষণা খরছে। ভেঁধে রেখেও আমি থাকে ধরে রাখতে ফারব কি না, শেই ছিন্তা খরছি। হার থুমি ভলছ ভাঁধ খুলে ধিতে!"

"আমি শুধু মুখটা খুলে দিতে বলছি।"

"থা হবে না।"

"ওর গুলি খাওয়ার জায়গাটা আমার রুমালটা দিয়ে বেঁধে দিতে চাই, স্যার?" আব্বা কালো পোশাক পরা বিপ্লবীটার দিকে আঙ্গুল তুলে বলেন। "রক্ত ক্ষরণে সে মারা যেতে পারে। আর তখন আপনাকে রাজার আদালতে জবাবদিহী করতে হতে পারে।"

"হামাকে খারো খাচে ঝভাব দীহী খরতে হবে নাহ।"

"ওদের কি করবেন, স্যার?"

"থানার উঠানে ঝুলিয়ে রাখব। আর থোমাদের সব ভিপ্লবিদের ভলব ধেখে ঝেতে।"

"আর যদি ওরা মারা যায়।"

"হোদের খঙ্খালগুলি ঝুলিয়ে রাখব।"

"এত কষ্ট করছেন কেন, স্যার? আপনাদের দেশে চলে যান।"

ইংরেজ সাহেব একটা হোঁচট খান।

আমি অবাক হই। এতক্ষণ মনে হচ্ছিল, ইংরেজ লোকটা নির্ভীক।

"খেন ছলে ঝাবো?" লোকটার গলা পরিষ্কার আর তীক্ষ্ণ।

"চলে যাবেন, সেটাইতো মনে হয়। এই শেষ সময়ে কেন আপনি এসব করছেন।"

"মিস্টার লুটফর, খিছু ঠ্রেইটর মিস্টার বল্ডউইনকে ধোঁকা ধিতে ছায়। আমি ফ্রমান খরতে ছাই হোরা মিথ্যুক। ইন্ডিয়াতে খোনো সমস্যা নাই।"

"আপনি বিভ্রান্তিতে আছেন, স্যার।"

"খি ভললে লুটফর থুমি?"

ইংরেজটা আব্বার শার্টের কলার টেনে ধরে আব্বাকে একটা ঝাঁকুনি দেন। "ইন্ডিয়া বিলংস ঠু দ্য ব্রিটিশ কিং, রিমেম্বার ইট!'

ছুরির ফলার মতো ইংরেজের কণ্ঠ। অনেকেই কাঁপছিল। কিন্তু আমার আব্বা তার চোখে চোখ রাখেন। ফোরাত নদীর তীরের উষ্ণ তীক্ষ্ণ চোখ বিদ্ধ করে উত্তর মেরুর শীতল আরক্তিম নীল চোখকে, যার মধ্যে জন্ডিস রোগের হলুদ আভা।

ইংরেজটা আব্বাকে ছেড়ে দেন।

আম্মা আমাকে শক্ত করে ধরে রাখেন। আমি আব্বাকে ভালোবাসি। ভালোবাসি আব্বার সাহসকে। শুধু চোখ দিয়ে একটা মানুষকে কাবু করে ফেলা যায়। লাঠি লাগে না, বন্দুক লাগে না, এমনকি একটা আচমকা থাপ্পরও না। ব্যাপারটা আমি মনে রাখি। পরে আমিও কয়েকবার চোখের এমন ব্যবহার করেছি। এমনকি শহীদ সাহেবের উপরও চোখের ব্যবহার করে ফল পেয়েছি। তবে সে কথা এখন থাক।

ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট ঘাটের দিকে তাকান। আমরা সবাই তাকাই। আমরা পলি রঙের পানি দেখি। দেখি সবুজ কচুরিপানার বিছানা আর তার উপর সাদা ফুলের দল। হাঁটু-পানিতে আধা-পচা আধা-জীবিত জল-লতা দেখি। ঢেউ দেখি, গাছের পাতার নাচন দেখি। গাঙচিল দেখি, দূরে বক পাখির গলা

দেখি। আরও দূরে ধানক্ষেত দেখি। এত কাছে জল, অথচ কোনও নৌকা দেখি না। আমি আব্বার দিকে তাকাই। আব্বা সাহেবটার দিকে তাকান। সাহেবের সাদা মুখের সাদা চামড়া আরও সাদা হয়ে যায়, যেন ওটা শুকিয়ে যাওয়া পান্নস সাপের খোসা। তারপরও ইংরেজ তাঁর গলা উপরে তোলেন।

"মিস্টার লুটফর, নৌকা খোথায়?"

"আমিওতো খুঁজছি," আব্বা বলেন।

অনেক মানুষ আমাদের পাশে জড়ো হয়। গামছা পরা, নেংটি পরা, লুঙ্গি পরা মানুষ। ইংরেজ রাজার প্রতিনিধি আমাদের সামনে। তাঁর নৌকা দরকার।

"কুদ্দুছ, এই দিকে যা। গৌতম, তুই যা ওই দিকে। আব্বাস, দেখ্, বিকল্প কিছু আছে কি না," আব্বা বলেন।

সবাই নৌকা খুঁজতে ছুটেন। আব্বাস নামের লোকটা বলেন কলাগাছ কেটে ভেলা বানিয়ে দিতে পারবেন। ইংরেজ সাহেবের শরীরটা টানটান হয়ে যায়। তিনি জানান তাঁর নৌকা ছাড়া চলবে না।

"থোমার নৌকাটা খোথায়, মিস্টার লুটফর?" সাহেব বলেন।

আব্বা আর একবার ঘাটের দিকে দেখেন, তারপর বাইগার এর বিস্তৃত অংশে চান। ইংরেজ বুঝেন, আব্বার নৌকাও গায়েব হয়ে গেছে। ওই বয়সে বিষয়টা বুঝিনি। এখন বুঝি। লজ্জা থাকলে পরের দেশ দখল বা শাসন করা যায় না। চুরি-ডাকাতি-জোর-জবরদস্তি করা যায় না। ওই ইংরেজ সাহেবটার চরিত্রে সব ছিল, শুধু লজ্জা ছিল না। তাঁর নৌকা দরকার। যার নৌকাই হোক না কেন।

"মিস্টার লুটফর, থুমি খি আমার ভিরুদ্ধে ষড়ঝন্ত্র খরছ?"

"না, স্যার।" আর একবার আব্বার শান্ত চোখ ইংরেজের চঞ্চল চোখজোড়া বিদ্ধ করে। লোকটা চোখ সরিয়ে নেয়। আব্বা মিথ্যা কথা বলেন না। আব্বা ষড়যন্ত্র বুঝেন না, ইংরেজটাও তা বুঝতে পারেন।

"যদি খোনো নৌকা না ফাই, হামি শাতার দিয়ে ফার হব, ঝেনে রাখ মিস্টার লুটফর। থারপর হেক ধিন হেসে থোমার হেই ঠুঙ্গিপাড়া ঘ্রাম হামি ঝালিয়ে ধিব। থোমার ভাড়ি ফ্রথম হাগুন ধিব।"

টুঙ্গিপাড়াবাসি কী ভাবছিল তখন তা না বুঝলেও পরে বুঝেছি। তারা ভাবছিল ইংরেজের মন যা চায় তা করতে পারে। শুধু টুঙ্গিপাড়া কেন, সারা ভারতবর্ষ তারা জ্বালিয়ে ছাই করে দিতে পারে। কিন্তু আমি দেখছিলাম সাদা লোকটার মনের দৃঢ়তা। সে-দিন আমি আরও শিখলাম, মনের দৃঢ়তা ছাড়া শাসন বা শোষণ কোনওটাই করা যায় না। শুধু আমি কেন, আমাদের আশ-পাশে জড়ো হওয়া সব লোকই ভয়ে কাঁপতে থাকে। অনেকে আবার নৌকা

খুঁজতে বের হয়। অনেকের চোখ বড় হয়ে যায়, চোয়াল নড়ে উঠে। আমার মনে হয়েছে, ওরা জানে নৌকা কোথায়। ওরা সব খুলে বলতে চায়। ইংরেজকে ওদের এত ভয়। আব্বা হাত নেড়ে ওদেরকে শান্ত করেন।

হলুদ লুঙ্গি পরা গৌতম নামের লোকটা কাছে এসে আব্বার কানে কথা বলেন। সবাই নিশ্বাস ছেড়ে হালকা হয়। নৌকা পাওয়া গেছে। একটু দূরে নদীর চরে একটা হিজল বন। জানা গেল, মাঝি হিজল গাছের আড়ালে আব্বার নৌকাটা লুকিয়ে রেখেছেন। অন্য নৌকাগুলো পালিয়ে গেছে।

গৌতম নামের লোকটা হিজল বনে যান। আমরা সবাই হিজল বনের দিকে তাকিয়ে থাকি। মাঝি ধীরে ধীরে নৌকা বেয়ে ঘাটে আসেন। আমি দেখি মাঝি ঠকঠক করে কাঁপছেন। খাকি ইউনিফর্ম পরা চারজনের দুই জন মাঝিকে নৌকা থেকে বের করে টেনে পাড়ের উপর নিয়ে আসেন। ইংরেজ সাহেব ইশারা করেন হাফ প্যান্ট পরা মোটা লোকটাকে। মোটা লোকটা তাঁর হাতে থাকা বেতের লাঠি দিয়ে মাঝির খোলা লবণের-স্তর জমা কালো পিঠে কড়াশ করে একটা বাড়ি মারেন।

আমি ভেবেছিলাম একটার বেশি বাড়ি উনি দিবেন না। কিন্তু তিনি দ্বিতীয়বার আঘাত করেন। আমাদের মাঝি কুঁকড়ে উঠেন। আমি ভাবলাম আর মারবেন না। কিন্তু হস্তি-মার্কা লোকটা আমাদের মাঝি বকুল দাসকে মেরেই চলেছেন। এক একটা বাড়ি পড়ার পর কী ভাবে যে বকুল দাস তাঁর পিঠটা টান করে শক্ত করে ধরেন পরের বাড়িটা গ্রহণ করার জন্য, তা জীবনে কখনও ভুলতে পারব না। বকুল দাসের ডান কান ফেটে রক্ত বের হয়। চোখ একটা ফুলে গেছে। হাফপ্যান্ট পরা দারোগা তবুও মাঝিকে মেরে চলেছেন।

"মিস্টার লুটফর," ইংরেজ সাহেব তাঁর প্যান্টের বেল্টে লাগানো খাপ থেকে একটা পিস্তল বের করেন। "হে ছাড়া হামার ফক্ষে থোমাদের শামলানো শম্ভব না। হামি আর হামার ফিস্তল। থোমরা হন্য ধিখে।"

আব্বা কোনও উত্তর করেন না। ইংরেজ সাহেব পিস্তল হাতে নৌকার দিকে এগিয়ে যান। গরুর গাড়ি থেকে আহত বিপ্লবী দুজনকে নামিয়ে নৌকার মেঝেতে রাখা হয়। ইংরেজ সাহেব আব্বার জন্য পাতা বিছানায় আরাম করে বসেন। খাকি হাফপ্যান্ট পরা চার জন পুলিশ ইংরেজকে ঘিরে নৌকার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে যান। আব্বার নৌকা নিয়ে ইংরেজ সাহেব চলে যান। আহত মাঝিই নৌকার হাল ধরেন। অন্য দুইজন, যাঁদের আঘাত করা হয়নি, তাঁরা গুলুই মেরে নৌকা চালান।

আমি কাঁদছিলাম। আব্বা আমাকে আম্মার কাছ থেকে নিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে রাখেন। আমি আব্বার ঘাড়ে মুখ গুঁজে কান্না থামাতে চেষ্টা করি, আর

আব্বার কথা ভাবি। তখন আমার মনে হয় আমার কান্নাকাটি করা ঠিক হচ্ছে না। আমি আম্মাকে দেখেছি কী ভাবে নীরবে সব কিছু দেখে গেলেন। কিন্তু আসলে আমি তখন এত ছোট যে আমি আব্বাকে পুরোপুরি অনুসরণ করতে পারছিলাম না। তারপরও বলব, অনেক অল্প বয়সেই আমি কান্না থামিয়ে ছোটখাট অন্যায়ের বিরুদ্ধে হাত-পা চালাতে শুরু করি।

আব্বার ঘাড় থেকে চোখ তুলে দেখি নৌকা ওপারের কাছাকাছি চলে গেছে। এ সময় একটা নৌকা ইংরেজের নৌকার পাশাপাশি কোথা থেকে যেন উদয় হয়। আব্বা আমাকে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরেন। ভয়ের একটা শিহরন আমার মেরুদণ্ড বেয়ে উপরের দিকে ওঠে। আমার গলাটা যেন ভেতর থেকে বরফ দিয়ে চেপে ধরা।

ঢশ্!

গুলির আওয়াজ শুনে আমি চমকে উঠি আর আব্বাকে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরি। আম্মা আব্বার খুব কাছে এসে দাঁড়ান। আমার কৌতূহলী চোখ কিছুতেই বাগ মানে না। আমি দেখি কালো শার্ট পরা একটা লোক দাঁড়িয়ে ছোট একটা বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়তে থাকেন ইংরেজের নৌকার দিকে। হাফপ্যান্ট পরা মোটা লোকটার চিৎকার শোনা যায়। তিনি নৌকায় লুটিয়ে পড়েন। চার জন পুলিশের দুই জন ইংরেজটার উপর ঝাঁপ দেন। গুলি খেয়ে, না ইংরেজটাকে গুলির আঘাত থেকে বাঁচাতে, বুঝতে পারি না। ইংরেজের নৌকার সবাই নীরব। মনে হয় সবার বুঝি মৃত্যু হয়েছে। একজন পুলিশ সদস্য নদীতে পড়ে যান। আক্রমণকারী নৌকা থেকে তিন জন লোক লাফ দিয়ে ইংরেজের নৌকায় ওঠেন। আমরা বুঝলাম ইংরেজ কেন তাঁর পিস্তল ব্যবহার করেননি। তিনি তাঁর দুই হাতেই গুলি খেয়েছেন। আক্রমণকারীরা বন্দি লোক দু'টিকে তাঁদের নৌকায় প্রায় ছুঁড়ে মারেন। আক্রমণকারী নৌকার মাঝির হাত ভালো। তিনি একবার এই দিকে গলুই মারেনতো, আর একবার ওই দিকে, একবার সামনে, দুই বার পিছনে। এভাবে তিনি বরাবর তাঁর নৌকাকে আক্রান্ত নৌকার কাছাকাছি রাখেন। আক্রমণকারীদের দুইজন তাঁদের নৌকায় ফিরে আসেন। শেষ লোকটা, একটা লাল শার্ট-পরা স্বাস্থ্যবান পুরুষ, ইংরেজের পাছায় কয়েকটা লাথি মারেন। যেই মাত্র লাল শার্ট পরা লোকটা তাঁর নিজের নৌকায় ঝাঁপ দেন, অমনি আব্বার নৌকা ইংরেজটা-সহ উল্টে যায়।

বিপ্লবীদের নৌকা দ্রুত দক্ষিণ দিকে যেতে থাকে। আর তার হাল ধরে আছেন আব্বার মাঝি বকুল দাস। কবে কখন তিনি ওই নৌকায় চলে গেলেন, আমরা কিছু টের পেলাম না। পুলিশগুলো বোধ হয় ডুবে গেছেন। ইংরেজটা

ডুবছেন আর মাথা তুলছেন। তাঁর আদার রঙের চুলে পলির ধূসর প্রলেপ লেগেছে। আমি আব্বার বুকের মধ্যে কাঁপতে থাকি। আম্মার একটা হাত আমার পিঠের উপর। আমি মনে মনে ইংরেজ লোকটার জন্য দুঃখ পাই। তখন তাঁর নিষ্ঠুরতার কথা আমার মনে আসে না। আমার মনে হচ্ছিল ডুবে মরার চেয়ে কষ্টকর আর কোনও মৃত্যু নাই। আমি নিশ্বাস নিতে কষ্ট পাই।

আমরা স্থান ত্যাগ করি না। কিছুক্ষণ পর দেখি, ইংরেজ লোকটা শুশুকের মতো বুকে ভর দিয়ে পাড়ের কাদামাটি হাতড়াচ্ছেন। তারপর তিনি নলখাগড়ার উপর দিয়ে গড়ান, আর তাঁর শরীরে লেগে থাকা পলির আস্তরণ কোনও কোনও জায়গায় খসে পড়ে। আমরা সবাই চোখ বড় করে নদীর অন্য পাড়ের দিকে তাকিয়ে আছি। হাতে গুলি লাগার কারণে লোকটা গড়িয়ে গড়িয়ে উপরে উঠলেন। না কি গুলির ভয়ে। ইংরেজ সাহেবকে জীবন্ত দেখে আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অনেকে ঘামছেন। আমি অনেককে কাঁপতে দেখলাম। নদীর অপর পাড়ে উঠে ইংরেজ সাহেব ধান ক্ষেত ধরে দৌড়াতে থাকেন। এ পারে যাঁরা যুদ্ধ দেখে খুশি হয়েছিলেন তাঁরা বুঝে গেছেন ইংরেজ লোকটা অমর। সবার চোখে আতঙ্ক। তাঁরা এমন কিছু শব্দ প্রয়োগ করে বিপ্লবীদের গালি দিলেন যার অনেকগুলোর মানে আমার তখনও জানা হয়ে উঠেনি। "তোরা ইংরেজের একটা ...ও ছিঁড়তে পারবি না," ধূসর রঙের ময়লা ধূতি পরা এক বৃদ্ধ বার বার বলতে থাকেন।

পরে বুঝেছি, যিনি যত সামর্থবান গৃহস্থ, সে দিন তিনি তত বেশি ভয় পেয়েছিলেন। কারণ টুঙ্গিপাড়া পুড়িয়ে ফেললে গরিবদের চেয়ে ধনিদের ক্ষতি বেশি হবে। তখন আমার হৃৎপিণ্ড ঠকঠক করছিল। টুঙ্গিপাড়া পুড়িয়ে ফেলা হবে। ইংরেজরা কীভাবে স্থানীয়দের শিক্ষা দেন তা সবার জানা আছে। নিষ্ঠুরতা ছাড়া তাঁরা ভারতবর্ষের আটাশ কোটি লোককে দাবিয়ে রাখতে পারতেন না।

তারপরও আমি ইংরেজটার সাহসের কথা ভাবি। তাঁর শুধু পা দিয়ে সাঁতার কেটে নদীর পাড়ে পৌঁছা, বুকে ভর করে নদীর পাড় বেয়ে উঠা, তাঁর ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে দৌড়ানো। ছুটন্ত ইংরেজের ঝুলন্ত হাত দুটি আমার চোখের উপর ভাসতে থাকে আর আমি আমার ভিতরের পরিবর্তন টের পাই। আমার শরীর শান্ত হতে থাকে। সাহস আর কষ্ট ছাড়া কিছু হবে না, এ বোধই যে আমার হয়েছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আমি সিদ্ধান্ত নিই, যদি তিনি দলবল নিয়ে টুঙ্গিপাড়া জ্বালাতে আসেন, আমি ইংরেজটাকে খুন করব। যে ভাবে পরি সে ভাবে করব। আমি সিদ্ধান্ত নিই আমি লুকিয়ে থেকে একটা হাতুড়ি দিয়ে ইংরেজটাকে পিছন থেকে আঘাত করব। তারপর তিনি যখন

বেহুঁশ হয়ে পড়ে যাবেন, তখন আমি হাতুড়ির বাড়িতে তাঁর মাথা ফাটাব। টুঙ্গিপাড়া পুড়িয়ে দিয়ে তিনি জীবন নিয়ে তাঁর ডেরায় ফিরতে পারবেন না। আমার শিশু-মন এ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেনি। আমি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ছিলাম।

সে দিন সন্ধ্যায় আব্বা আমাকে নিয়ে বসেন। জানতে পারি আব্বার কোর্টের চাকরির সূত্রে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে তাঁর পরিচয় হয়েছিল। আরও জানতে পারি, যে লোকটা ইংরেজকে গুলি করেছেন তাঁর নাম পূর্ণ দাস। এত অল্প বয়সে তিনি বিপ্লবী হয়েছেন। আমার জিনিসটা খুব ভালো লেগেছিল। পূর্ণ দাসকে নিয়ে গর্ব হচ্ছিল। এখন তিনি মাদারীপুরের মর্দবীর। যদিও এর সব কিছু তখন তেমন ভালো করে বুঝিনি, এখন যেমন করে বলছি।

"এ অবস্থা থাকবে না, খোকা," আব্বা বলেছিলেন সে সন্ধ্যায়। "ইংরেজদের দিন শেষ। দেশ স্বাধীন হবে।"

"দেশ স্বাধীন হবে মানে কি আব্বা?"

সে দিন আব্বা আমাকে বুঝিয়েছিলেন, আমরা ইংরেজদের অধীন। আর কত দিন তাঁদের দ্বারা আমরা শোষিত হয়েছি। জীবনে প্রথম আব্বাকে সে-দিন সব চেয়ে ভালো করে জেনেছিলাম। আব্বা এক দিকে যেমন ইংরেজদের শোষণ এর কথা বলেছিলেন, আর এক দিকে তারা যে এ দেশে কিছু ভালো কাজ করেছিল, তা-ও বলেছিলেন। আমি আব্বাকে বলেছিলাম, "ওরা ভালো হতে পারে না, ওই লোক আপনার কলার ধরে টেনেছে।"

"খোকা, সে ভিনদেশি শাসক," আব্বা বলেছিলেন। "তাই আমি গায়ে মাখিনি। কিন্তু কখনও যদি দেশ স্বাধীন হয়, আর নিজের দেশের শাসক যদি এমন কিছু করে, আমি অপমানিত হব।"

সে-দিন আমি পণ করেছিলাম, যে ভাবে পারি দেশ স্বাধীন করব, আর আমি নিজে শাসক হব। আমি শাসক হয়ে কখনও কারও কলার বা দাড়ি বা চুল টেনে ধরব না, কাউকে ঘাড়-ধাক্কা দিব না। অনেক দিন এই দিবাস্বপ্ন দেখে গেছি। তারপর তা আবার ভুলেও গেছি। এক সময় আমি আব্বা আম্মাকে অনুসরণ করেছি। রেণুকে নিয়ে তাঁদের মতো সংসারী হওয়ার স্বপ্ন দেখেছি।

এর মধ্যে সতেরো বছর চলে গেছে। কোনও ইংরেজ বা ইংরেজের কর্মচারি টুঙ্গিপাড়া জ্বালাতে আসেনি। তবে টুঙ্গিপাড়ার প্রতি আমার আবেগ এখন সে দিনের চেয়ে অনেক বেশি। কারণ টুঙ্গিপাড়ার পরতে পরতে রয়েছে আমাদের পায়ের ছাপ। টুঙ্গিপাড়ার ধূলি আমাদের আপন হয়েছে। আমাদের হাতের পরশ লেগে আছে টুঙ্গিপাড়ার ফুল-ফল-লতা-পাতায়। আমাদের পৃথিবীর বিস্তার এই টুঙ্গিপাড়া থেকে। টুঙ্গিপাড়াই আমাদের শেষ আশ্রয়।

আমি একটা নতুন পাঞ্জাবি পরে পাক ঘরে যাই। দেখি আমার চার বোন আর ছোট ভাই নাসেরকে। মহিলারা নানাবিধ কাজে ব্যস্ত। সবার মাথা নোয়ানো। সবার হাত চলে। কারও বুঝি সময় নেই অন্যের দিকে তাকানোর। মেজো বোন আছিয়া বেগমের বড় ছেলে মণি বসে আছে নাসেরের পাশে। মণির জন্মের পর আব্বা-আম্মা অনেক খুশি হয়েছিলেন। আছিয়া বুবুর বাসা আমাদের কোলকাতার ঠিকানা। যে বাসায় থেকে আব্বা আমার চোখের চিকিৎসা করিয়েছিলেন। যে বাসায় উঠব যখন কলেজে যাব। অন্তত হোস্টেলে সিট পাওয়া পর্যন্ত। মণি আমাকে দেখে লাফ দিয়ে এসে জড়িয়ে ধরে। "আজ বড় মামার ফুলশয্যা। আজ বড় মামার ফুলশয্যা!"

আমার বোনের স্বাস্থ্য যতটা ভালো আমার ভাগনেটা ততটাই লিকলিকে। ওই বয়সে অবশ্য আমিও ওর মতোই ছিলাম। তবে মণি মনে হয় আমার চেয়েও পাতলা।

"বড় মামা, আমি রাজনীতি করব," মণি বলে।

সময়টা এমন যে মনে হয় অনেক শিশু মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় সংগ্রাম করে দেশ স্বাধীনের স্বপ্ন দেখে। ইংরেজদের তেজ এখন অনেক কমে এসেছে, বিশেষ করে জার্মানির সাথে যুদ্ধে জড়ানোর পর। তারপরও ওরা ভারত ছাড়তে চায় না। ওদের নিজের দেশ বিলাত ভারতের একটা উঠানের

সমান। ওরা কেন ভারত ছাড়তে চাইবে? আবার এ কথাও সত্যি, রাষ্ট্রকে ধর্ম থেকে আলাদা করে দেয়াতে ওদের জ্ঞান আর বিজ্ঞান আর শক্তির এত উন্নতি হয়েছে যে, ওরা গুটিকয়েক লোক মিলে বিরাট ভারতবর্ষকে শাসন করতে পারছে। আর আমরা? হিন্দু-মুসলমান বিভেদজনিত ঘৃণায় ডুবে আছি। কারও কারও মধ্যে হয়তো ঔদার্য আছে। তবে মোটা দাগে সাম্প্রদায়িকতার বিষয়টা চিন্তা করলে অবাক হতে হয়। সভ্যতার কত পিছনে আছি আমরা। আরও কত কাল পেছনে পড়ে থাকব তা শুধু আল্লাহ জানেন।

ধর্ম-বর্ণ-ভাষা এসব বৈচিত্র সব সময় আমাকে পুলকিত করে। আমি বৈচিত্রের মধ্যে সৌন্দর্য দেখি। মনের অসচেতন নিষ্ঠুরতা মানুষকে সাম্প্রদায়িক করে। সে-বিষ ছড়িয়ে সে নিজের আর অন্যের জীবনে দুঃখ ডেকে আনে। এই সামষ্টিক অসচেতনা দেশ ও জাতি ধ্বংস করে। পাড়া মহল্লা জ্বালিয়ে দেয়। মানুষকে জবাই করে কিংবা আগুনে পোড়ায়। সংখ্যাগুরুর ঘৃণার নিচে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যুগযুগ ধরে অন্তরে হীনম্মন্যতা লুকিয়ে রাখে। এই হীনম্মন্যতা নিয়ে জীবন ধারণের চেয়ে কষ্টের বিষয় পৃথিবীতে আর কিছু নাই।

ভারতবর্ষে আমরা মুসলমানরা মাইনরিটি। ফলে আমাদের মধ্যে ভয় ঢুকে গেছে। হিন্দুরা সেই ভয় কাটানোর জন্য কেন কিছু করছেন না, এ কথা যখন ভাবি তখন আমার মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে। হিন্দু-প্রধান ভারতে মুসলমানদের স্বার্থ কীভাবে রক্ষা হবে তা এখন আমাদের নেতাদের দুশ্চিন্তার কারণ। ভারত স্বাধীন হবে ঠিকই। কিন্তু দুই ভাগ হয়ে। আমাদের অনেকের ভয়, দাঙ্গা লেগে যেতে পারে। তখন কত মানুষ খুন হবে? তখন হয়তো স্বাধীনতা পাওয়া যাবে। কিন্তু স্বাধীনতার আনন্দটুকু পাওয়া যাবে না। আমি বুঝি না, মানুষ কেন এত অবুঝ হয়। একটু ছাড় দিলে, একটু আলোচনা করলে, একটু মেনে নিলে, এরা মনে করে এদের সব চলে গেল। দানের মধ্যে যে সম্প্রীতির সুখ, এরা তা বোঝে না। আমার তিন বছর বয়সের ভাগনে মণি যেন তা বুঝতে পেরেছে। তাই সে আমার কাছে রাজনীতি শিখতে চায়। নিজেকে আমি বলি, মণি, অসাম্প্রদায়িক চেতনাই হবে তোমার রাজনীতির প্রথম পাঠ। আমি মণিকে ওর জায়গায় বসিয়ে দিই।

ছোট বোন হেলেন, ছোট ভাই নাসের আর আমি পাটির উপর বসি। মেজো চাচি আর বড় ফুফু আমাদেরকে একটা করে প্লেট দেন। প্লেটে দই, চিড়া, কলা, গুড়। আমার বড় বোন আমাকে পান্তাভাত আর ভাজি রুই মাছ খেতে দেন। ভাত-মাছ দেখে আমার ভালো লাগে। এটা আমার সকালের খাবার। আমি মন ভরে খাই। তারপর বড় বোন আমার জন্য চিড়া, কলা, নারকেল, গুড় এক সাথে মেখে দেন। আমি তা তৃপ্তির সাথে উদরে চালান করি। আহা কত আনন্দ খেতে।

জীবনে প্রতি বেলা আহার করে আমি যতটা তৃপ্তি পেয়েছি অন্তরে ততটা ব্যথাও পেয়েছি। আহারের সময় প্রত্যেক বার মনে না আসলেও অন্তত আহারান্তে আমার ক্ষুধার্ত মানুষের কথা মনে আসে। আমি মনে মনে বলি, ভাগনে মণি, তোমার রাজনীতির দ্বিতীয় পাঠ হবে এটা জানা: ক্ষুধার যন্ত্রণা কেমন? কত গরিব আর বঞ্চিত এ দেশের মানুষ? তাদের ক্ষুধা নিবারণ করার জন্য তুমি রাজনীতি করবে।

আম্মা রেণুকে নিয়ে এসে পাটির উপর বসান। মণির অন্য পাশে। রেণু ওর ডান হাত দিয়ে মণির গলাটা জড়িয়ে ধরে। মণিও নিজেকে রেণুর কাছে ঠেলে দেয়। যতক্ষণ রেণু মণির উপর থেকে ওর হাত তুলে না নেয়, ততক্ষণ আমি ওদের দেখি। আমার চোখ জুড়ায়।

রেণুকে প্রথমে কিছুটা অপ্রতিভ মনে হয়েছিল। মণিকে আদর করতে পেরে ও যেন আবার নিজেকে ফিরে পেয়েছে। আমার মনে হয় আম্মা রেণুকে দিয়ে একান্তে কোনও আচার পালন করিয়েছেন, কোনও দোয়া পড়ে ফুঁ দেয়া বা এমন একটা কিছু হবে। আমার বড় বোন ফাতেমা বেগম উঠে গিয়ে রেণুর মাথায় হাত রাখেন। "ভয় পাসনে, রেণু। তোর চেয়েও কম বয়সে আমারও ফুলশয্যা হয়েছিল। আর খোকাতো তোর অপরিচিত কেউ নয়।"

সবাই আমাদের দিকে এমনভাবে তাকায়, যেন আমাদেরকে সবাই আরও বেশি ভালোবাসছে, আমাদের জন্য তাদের মায়া বেড়ে গেছে। যেন পাকঘরের সব নারী আজ কিশোরী হয়ে গেছে, যেন আজ ওদের সবার ফুলশয্যা।

আমি রেণুর গাল লাল হয়ে যাওয়া খেয়াল করি। "আপনারা কী শুরু করলেন?" আমি বলি।

জয়নাল এসে খবর দিলেন রমাপদ বাবু এসেছেন। জয়নালের অনেক বয়স হলো। আমার ছোটবেলা থেকে তিনি আমাদের বাড়িতে আছেন। নিষ্ঠাবান কর্মঠ মানুষ। জয়নাল বলেন, রমাপদ বাবু আমাকে দেখতে চান। আমি হাত ধুয়ে উঠানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হই।

সাদা ধুতি আর নীল পাঞ্জাবি পরা রমাপদ বাবুর নাদুসনুদুস সাড়ে চার ফুট ফর্সা শরীরের মধ্যে সব চেয়ে দর্শনীয় হলো ওনার খাড়া নাক। মাথার খুলিতে অর্ধবৃত্ত টাক অন্তিম বসন্তের সূর্যের নিচে চকচক করে। সেই টাকের ডান দিকে সেলাইয়ের দাগটা রমাপদ বাবুর ক্ষত্রিয় অভিজাত মাথার উপর বড় বেমানান লাগে।

দাগটা দেখে আমার মন খারাপ হয়। চার বছর আগে আমি তাঁকে দাগটা উপহার দিয়েছিলাম। আমাদের এই গোপালগঞ্জ মহকুমায় অনেক জায়গাতেই আমরা মুসলমানরা সংখ্যালঘু। রামপদ বাবুরা গায়ের জোরে তখন আমাদের অনেক পীড়ন করছিলেন। যদিও আজ তিনি ভালো মানুষ। ভালো-মন্দ আসে শিক্ষা থেকে। রমাপদ বাবু তা হয়তো একটু বেশি বয়সে শিখেছেন। তারপরও তার মূল্য হয় না। এই যে তিনি আমার বিয়ের তদারকি করতে আসলেন। এ ঔদার্য অমূল্য। যদি মানুষ মানুষের মতো হতো, তবে এমন সুন্দর দৃশ্যে পৃথিবী ভরে যেত। আজকের দিনে আমাদের উঠানে রমাপদ বাবুর আবির্ভাবের চেয়ে সুন্দর জিনিস আর কি হতে পারে? আজকে আমি তাঁকে অনেক ভালোবাসি।

কিন্তু আটত্রিশ সালে তা করতে পারিনি। সে বছর শীতকালে ফজলুল হক সাহেব আর শহীদ সাহেব গোপালগঞ্জ এলেন। ফজলুল হক বাংলার মূখ্যমন্ত্রী। আর শহীদ সাহেব তাঁর শ্রমমন্ত্রী। আমরা গোপালগঞ্জে তাঁদের অভ্যর্থনা দিলাম। কিন্তু হিন্দুরা, যাঁরা ঐক্যবদ্ধভাবে কংগ্রেসের সমর্থক, তা পছন্দ করলেন না। কারণ হক সাহেব কংগ্রেস ত্যাগ করে মুসলিম লীগের হয়ে ইংরেজের অধীনে বাংলার প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। মুসলিম লীগ হলো মুসলমানদের সংগঠন। ব্যাপারটা আমাকে পীড়া দেয় যখন আমি মুসলিম লীগকে কংগ্রেসের সাথে তুলনা করি। কারণ কংগ্রেসে সব সম্প্রদায়ের লোকই

ছিল, যদিও হিন্দুরা সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। একটি সংগঠনে শুধু একটি ধর্মের লোক থাকবে, তা আমি কখনও মানতে পারিনি। তারপরও ভারতবর্ষের সার্বিক দিক চিন্তা করে আমি মুসলিম লীগের সভ্য হয়েছি। আমার স্বপ্ন এক দিন আমার রাজনৈতিক দলের নামের সাথে কোনও সম্প্রদায়ের নাম থাকবে না। জানি না, কবে তা করতে পারব?

ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের কথা তখনও আমার ভালো করে জানা হয়ে উঠেনি। তবে আমাদের স্থানীয় কংগ্রেসের হিন্দুরা সাম্প্রদায়িক ছিলেন। হক সাহেবকে অভ্যর্থনা জানানোর কথা শুনে তাঁরা অগ্নিমূর্তি ধারণ করেন। তাঁরা অনুষ্ঠান ব্যর্থ করার সব ধরনের চেষ্টা করেন। বিষয়টা আমাকে অনেক আঘাত দেয়। হক সাহেব আর শহীদ সাহেব বাংলার নেতা। তাঁদেরকে সম্মান জানানোর জন্য সাম্প্রদায়িকতা কেন টেনে আনতে হবে? ব্যাপারটা আমি মানতে পারিনি। জান দিয়ে খেটেছি, যাতে তাঁদের অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান সফল হয়। সফল করেছিও। জন্মের পর থেকে কখনও আমি মানুষের বিভাজন কল্পনা করতে শিখিনি।

অনুষ্ঠান নষ্ট করার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে হিন্দুরা এতটা ক্ষুব্ধ হন যে, তাঁদের ক্রোধ আমাদের ছোট্ট শহর গোপালগঞ্জকে গিলে ফেলে। উত্তেজনা মাদারীপুরেও ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিদিনই কোনও-না-কোনও ঘটনা ঘটে। হিন্দুরা প্রকাশ্যে রাস্তাঘাটে মুসলমানদের গালি দেন। মুসলমানরাও গালির জবাবে গালি দিয়ে দ্রুত স্থান ত্যাগ করেন, যাতে হিন্দুদের হাতে মার খেতে না হয়।

এ পরিস্থিতিতে আমি নিশ্চুপ থাকতে পারিনি। আমি আমার দলের ছেলেদের সাথে মিলে হাতে লাঠি নিয়ে রাস্তা পাহারা দেয়া শুরু করি। প্রতি দিন আট-দশ ঘণ্টা আমরা রাস্তায় টহল দিতাম। পিঠে বাড়ি দেয়ার সময় খেয়াল করতাম না, কে হিন্দু, কে মুসলমান। আমরা শুধু দেখতাম কে ট্রাবলমেকার। দুই তরফেই কিছু গোঁয়ার পাওয়া যেত যাদের কিছুটা নির্দয়ভাবে প্রহার করে নিবৃত্ত করতে হত। মাঝে মাঝে দল বেঁধে মাদারীপুর গিয়ে সাম্প্রদায়িক কীটগুলোকে শায়েস্তা করে আসতাম।

একদিন মাদারীপুর থেকে ফিরে আসতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। বাসায় এসে দেখি আমার আব্বা চিন্তিত মুখে বসে আছেন। আব্বার উল্টা দিকে সোফায় বসে আছেন আমাদের গোপালগঞ্জের দারোগা সাহেব, পরনে সাদা পাজামা পাঞ্জাবি, নাকের নিচে মিলিটারি গোঁফ। দারোগা সাহেবের পাশে আমার ছোট দাদা, খান বাহাদুর শেখ আবদুর রশিদ।

রেণু আর আম্মা অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের জন্য অনেক কাজ করেছেন, মেহমানদের জন্য রান্না করেছেন। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর তারা টুঙ্গিপাড়ায় চলে যায়, বাড়ির দেখাশোনা করতে। দুই দিন পর তারা ফিরে আসবে।

বছরখানেক আগে আব্বা যখন আমাকে মেরেছিলেন, তখন রেণুর কী অবস্থা হয়েছিল, তা আমার চোখের উপর ভেসে ওঠে। এই সন্ধ্যাটিতে রেণু গোপালগঞ্জে নাই, ব্যাপারটা আমাকে স্বস্তি দেয়।

আমি হারিকেনের আলোয় দেখি, আমার দাদার মুখও কালিমালিপ্ত। আশঙ্কায় আমার নিশ্বাস গলার কাছে আছাড় খেয়ে পড়ে। আমি সালাম দিয়ে ভেতরের ঘরে যাওয়ার জন্য পা বাড়াই। "দাদা ভাই, বসো এখানে," ছোট দাদা বলেন। আমি কিছুক্ষণের জন্য থেমে থাকি। তারপর একটা মোড়া টেনে মুরুব্বিদের থেকে একটু দূরে গিয়ে বসি। কারণ ভয় পাওয়া ছাড়াও, আমি খুব ঘামছিলাম। পেটে এমন ক্ষুধা তখন দুই সের চালের ভাত কাঁচা মরিচ ডলে এক নিমেষে শেষ করে দিতে পারতাম।

"দারোগা সাহেব, আপনি ওকে বুঝান," আমার ছোট দাদা বলেন।

আমি এক পলক আব্বার দিকে চাই। আমার কারণে আব্বা বিব্রত। যদিও দারোগা সাহেব আব্বার বন্ধু। আমার দাদা কালো আসকান পরেছেন। তিনি বংশ গৌরবে গৌরবান্বিত। দাদার দিকে তাকিয়ে আমি অনুভব করি, গর্ব বস্তুটা হলো মানুষের আর একটা অদৃশ্য বিষাক্ত আবরণ। মনে হয়, শুধু ধর্মীয় ভেদাভেদ নয়, এই সমাজের সকল গোমর ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়া দরকার। রাশিয়া সেটা করেছে বলে শুনেছি। এত কঠিন কাজ কী করে তারা করল, তা অবশ্য আমি এখনও বুঝতে অক্ষম। শুনেছি খুনের মাধ্যমে তারা সমস্যা সমাধানের দ্বারপ্রান্তে এসে গেছে। চীনেও সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য গৃহযুদ্ধ চলছে, অর্থাৎ খুনাখুনি। একটা অন্যায়ের প্রতিকার আর একটা অন্যায় দিয়ে করা যায়, এটা মেনে নেয়ার জন্য আমি নিজের ভেতর থেকে সাড়া পাই না। তা হলে কি *সারভাইভাল অব দি ফিটেস্টই* চূড়ান্ত সত্য? আর তা-ই যদি হয়, ইতিহাসতো মানুষকেই এক দিন নিকৃষ্টতম প্রাণি হিসাবে চিহ্নিত করবে।

অন্তিমে আমি মানুষকেই ভালোবাসি। মানুষের ক্ষতির কথা তাই মাথায় আসলে মন খারাপ হয়। জানি না মানুষের বিবেক কবে সাড়া দিবে? শিশুদের প্রথম পাঠের মধ্যে বিবেক জাগানোর শিক্ষা থাকা উচিত। কারণ বিবেকের শিক্ষা শৈশবে না দিলে, পরবর্তী সময় তা দেয়া কঠিন হয়, এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। আমি আমার ভেতরের দ্বন্দ্ব তিনজন মুরুব্বিকে বুঝতে দিতে চাই না। বিক্ষত অন্তর সামলানোর জন্য আমি শরীরটাকে সোজা করে রাখি। আমি এঁদের কাঠগড়ায়। আমি বিচারের জন্য অপেক্ষা করি।

দারোগা সাহেব তাঁর ফোলা চোখ দু'টি তুলে আমার দিকে চান।

"কত জনের পিঠে আজ বেত্রাঘাত করেছ, মজিবর?"

কথাটা বলে উনি মিটিমিটি হাসেন। মনে হলো ওনার নাক ততটা সুঁচালো নয় যতটা সাধারণত মনে হয়। আমি মাথা নিচু করি। হাবু শেখ চা, কলা, মুড়ি, নিমকি আর বেলা বিস্কুট এনে টেবিলের উপর রাখেন।

"দাদা ভাই, তোমাকে লজ্জা দেয়ার জন্য দারোগা সাহেব আসেন নাই," শেখ আবদুর রশিদ বলেন।

দারোগা সাহেব মিষ্টির রসে চুবিয়ে নিমকি খান। "মজিবর, তোমাদের বয়স কম। তোমরা সমস্যার গভীরতা বুঝতে পারছ না। মারামারি না করে মানুষকে সংগঠিত করো। আমাদের সামনে অনেক বিপদ।"

"আমি যতটা পারি এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব," আমি বলি।

তিনজন মুরুব্বিই আমার দিকে কটাক্ষপাত করেন। বুঝলাম, কথাটা আমি একটু বেশি দৃঢ়তার সাথে বলে ফেলেছি। তাঁদের নিশ্চয়ই খটকা লেগেছে। আমি এখনও একজন সামান্য রাজনৈতিক কর্মী। আর এঁরাতো আমাকে ভালোবেসে সাবধান করে দিতে আব্বার কাছে এসেছেন।

"হিন্দুরা কোনও একটা চক্রান্ত করে তোমাকে বিপদে ফেলতে পারে," দারোগা সাহেব বলেন। "ধরো তুমি জেলে গেলে, তখন তুমি কি আর মুসলমানদের জন্য কাজ করতে পারবে?"

মুসলমানদের জন্য কাজ, কথাটা আমার কানে বাজে। আমি সকল মানুষের জন্য কাজ করতে চাই।

দারোগা সাহেব যে-বিষয়টা নিয়ে আমাকে সতর্ক করলেন, তা যে আমি ভাবিনি, তা নয়। কিন্তু আমার কাছে তাঁর প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই।

দারোগা সাহেব আর আমার ছোট দাদা রাজনীতিবিদের চরিত্র বিশ্লেষণ করেন। তাঁদের পছন্দ জিন্নাহ সাহেব।

"খাঁটি মানুষ," দারোগা সাহেব বলেন।

আমি বুঝলাম দারোগা সাহেব দেশের খবর রাখেন।

"পণ্ডিত নেহরুর সাথে টেক্কা দেয়ার মতো ওই এক জনই আছে," আমার দাদা বলেন।

"হক সাহেবও তাঁদের মতো বড় নেতা," দারোগা সাহেব বলেন।

"উনি আমাদের গর্ব," ছোট দাদা বলেন।

"কিন্তু উনি বড় চঞ্চল," দারোগা সাহেব বলেন।

তাঁদের সবার পক্ষে এবং বিপক্ষে মত আছে। শুধু গান্ধী ছাড়া। গান্ধীকে সবাই ভালোবাসেন।

আমি সবার কথা শুনি। সব নেতাকে শ্রদ্ধা করি।

আমার আব্বা খুব কম কথা বললেন। আব্বা তাঁর স্বভাবের গাম্ভীর্য দিয়ে সব কিছুর উপর একটা বিশিষ্টতা নিয়ে আসেন। আব্বা তাঁর ব্যক্তিত্ব দিয়ে যা উপস্থাপন করতে পারেন, অন্যরা ধন-মান-পদমর্যাদার জোরেও তা পারেন না।

"লুৎফর সাহেব, আপনি যা ভালো বুঝেন–" দারোগা সাহেব বলেন।

"আমার ছেলে যদি দেশের জন্য কাজ করে, আমি বাধা দেব না," আব্বা ভদ্রভাবে কিন্তু দৃঢ়তার সাথে বলেন।

আমি আব্বার দিকে চাই। কী উজ্জ্বল দুটি চোখ। এক বছরেই আব্বার এই পরিবর্তন। আমার গলা কাঁপে। আর চোখও ভিজে যায়। আমার দলের ছেলেরা আমার সাথে থাকার জন্য নিয়মিত তাদের পিতাদের কাছে মার খায়। আমি দীর্ঘশ্বাস থামাতে পারি না। যদি ভারতবর্ষের সব পিতা আমার পিতার মতো হতেন, তা হলে আমরা তরুণরাই ভারতের অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারতাম।

আমি আর আব্বা দারোগা সাহেবকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিই। উনি চলে গেলে আমরা রাতের আহার করি। ছোট দাদা আমাদের বাসায় রাত্রি যাপন করেন।

সে রাতে আমি একটা কথা বার বার ভাবছিলাম। আমরা যারা রাস্তা পাহার দিতাম তারা সবাই মুসলমান ছেলে। আমি শত চেষ্টা করেও একজন হিন্দু বন্ধুকে এই কাজে নিযুক্ত করতে পারিনি। অথচ ছয় মাস আগেও যে কোনও হিন্দু ছেলেকে ডেকে আমি কাজ করিয়েছি। এখন যে তারা নিজেদের সরিয়ে নিয়েছে, বিষয়টা আমাকে খুব কষ্ট দেয়।

শেষমেশ দারোগা সাহেবের কথা সত্য হয়। আমি বিপদের সম্মুখীন হই। তাতে অবশ্য বড় একটা লাভও হয়। আমি জেনে গেছি, রেণু ছাড়া আমার জীবন চলবে না। তখন রেণুর বয়স মাত্র আট। আর বিপদ আসে রমাপদ বাবুকে আহত করে।

চৈত্রের সে বিকালে গোপালগঞ্জের ক্লাবের মাঠে ফুটবল খেলে বাড়ি আসি। পেছন থেকে আমাদের সকলের পরিচিত এবং আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয় শামসুদ্দিন মোক্তার সাহেবের ডাক আসে। আমি ফিরে তাকাই। আর মোক্তার সাহেবের হালকা কুঁজো শরীর দেখতে পাই। উৎকণ্ঠায় তিনি আরও বেশি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন।

"মালেককে সুরেন ব্যানার্জির বাড়িতে ধরে নিয়ে গেছে," মোক্তার সাহেব বলেন। "যদি পারো একবার যাও। তোমার সাথে ওদের বন্ধুত্ব আছে। দেখো কিছু করতে পার কি না।"

সুরেন ব্যানার্জি *হিন্দু মহাসভা* নামক সংগঠনের গোপালগঞ্জ শাখার সভাপতি। চরম সাম্প্রদায়িক লোক। মোক্তার সাহেব বন্ধুত্ব বলতে যা বোঝাতে চেয়েছেন, তার আসলে ওই সময় কোনও অবকাশ ছিল না। তবে আমি চেষ্টা করতাম চলমান সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার মধ্যেও কোনও হিন্দু যেন মুসলমানদের কাছে হয়রানির শিকার না হন। এ জন্য অনেক হিন্দু আমাকে পছন্দ করতেন।

শরীরে খেলার ক্লান্তি নিয়ে আমি তখনও ঘামছিলাম। মালেক আমার বন্ধু। কী করব বুঝতে পারছিলাম না। মালেকের হাঁপানি আছে। বেশি মার খেলে সে মরে যেতে পারে। সে রকম কিছু হলে সারা গোপালগঞ্জে আগুন জ্বলবে। অনেক মুসলমান আর হিন্দু দাঙ্গায় মারা যাবে। সংখ্যালঘিষ্ঠ আর অপেক্ষাকৃত দরিদ্রতর এবং দুর্বলতর হওয়ায়, মুসলামনরাই বেশি মরবে। আমি সিদ্ধান্ত নিই, যে ভাবেই হোক, ব্যাপারটা বেশি দূর এগুনোর আগে মালেককে উদ্ধার করব।

আমি জানতাম আমি একা গেলে ওরা আমাকেও আটকাবে। দারোগা সাহেব আমাকে সাবধান করে দেয়ার আগে থেকেই কিছু আগ্রাসী হিন্দুর

কার্যকলাপ আমার কাছে সন্দেহজনক মনে হতে থাকে। কাটাইল কথাটা শুনতে শুনতে আমার তখন তা কানে সয়ে গেছে। এ গালিটা সব বয়সের মুসলমান পুরুষের জন্য বরাদ্দ ছিল, কারণ মুসলিম পুরুষরা সবাই খতনা করা থাকত। নোয়াখালী থেকে আসা কিছু হিন্দু টাউন হলের কাছে বাস করত। তারা কাটাইল শব্দটা গোপালগঞ্জে আমদানি করে। তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলার সময় আমাকে হাটপা বলে ডাকত। তাদের কাছে জানতে পারি নোয়াখালীতে মই কে হাটপা বলে। আমি লম্বা বলে তারা হাটপা বলে আমাকে টিটকারি করত। আমার দলের ছেলেরা মা আর বোনের নামে গালি খেত। আমার ক্ষেত্রে রেণুকেও টেনে আনা হতো। শহরের সবাই জানত আমি বিবাহিত। আমি চেষ্টা করতাম উত্তেজিত না হতে। এমনকি আমি যে ওদের গালিগালাজ শুনছি, তা-ও ওদের বুঝতে দিতাম না। মুসলমানরাও হিন্দুদের প্রচুর গালি দিত। হিন্দুরা মালাউন শব্দটা শুনলে খুব অপমানিত হতো। আর মুসলমানরা এই অস্ত্রটা অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে প্রয়োগ করত। আমি যতই চেষ্টা করি না কেন, আমার ছেলেদের হিন্দুদের মালাউন বলে গালি দেয়া থেকে বিরত রাখতে পারতাম না। আমার সবচেয়ে বেশি আপত্তি ছিল নারীদের গালিগালাজ করার প্রতি। নারীদের নামে গালি দেয়া বা গালি শোনার বিষয়ে আমি সংবেদনশীল ছিলাম। কারণ তখন পৃথিবীর সব নারী আমার কাছে হয় রেণু নয় আম্মা। তাদের অসম্মান আমি সহ্য করতে পারতাম না। অথচ নারীদেরকেই বেশি বেশি গালি দেয়া হত। আমি অনেক ছোটবেলা থেকে এই বিষয়টা লক্ষ করেছি। পুরুষরা নিজেরা ঝগড়াফ্যাসাদ করে আর গালি দেয় প্রতিপক্ষের নারীদের। আমি তা মানতে পারতাম না।

আমি পাশের বাড়িতে গিয়ে আমার দলের ছেলে রশিদকে বললাম সবাইকে ডাকতে। মালাউন মালাউন বলে চিৎকার করতে করতে রশিদ দৌড়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। দশ মিনিটের মধ্যে ও ছয় জনকে ডেকে আনে। আমাদের এক গোছা লাঠি ছিল। তা করিমের বাড়িতে লুকিয়ে রাখা হতো। করিম লাঠির বোঝা কাঁধে করে নিয়ে আসে। রশিদ আমার লাঠিটা আমার হাতে ধরিয়ে দেয়। আমরা আট জন বালক সুরেন ব্যানার্জির বাড়ির দিকে রওয়ানা দিই।

মাঠ থেকে আসার সময় খেয়াল করিনি। এখন বুঝলাম শহরেও অনেক উত্তেজনা চলছে। রাস্তায় কোনও মানুষ দেখি না আর রাস্তার দুই ধারের প্রায় সব দোকানই বন্ধ। "এক ড্রাম কেরোসিন আর একটা ম্যাচবাক্স দরকার," জগলু পেছন থেকে বলে। "আমরা সুরেন মালাউনের বাড়িটা জ্বালিয়ে দিতে পারতাম।" জগলুর কথা শুনে আমার গা শিউরে ওঠে। আকবর আলীর

বাড়িতে ইট মারার কথা মনে আসে। ওই বাড়ির নারী ও শিশুরা যে আর্তচিৎকার করেছিল তা যেন কানে শুনতে পাই। রাতের বেলা কারও বাড়ি জ্বালিয়ে দিলে সে তার স্ত্রী-সন্তান আর বৃদ্ধ বাবা-মা সহ পুড়ে মরতে পারে, এ কথা এ ছেলেগুলোর মনে আসছে না। জগলুর কথা শুনে আমার একটা নতুন উপলব্ধি হয়। সুযোগ পেলে আমাদের মুসলমান ছেলেরাও যে কোনও নিষ্ঠুর কাজ করতে পিছ-পা হবে না। চোখ বন্ধ করে ভাবতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু হাঁটার জন্য চোখ বন্ধ রাখতে পারছিলাম না। তবে আমি পণ করি, সারা জীবন সাম্প্রদায়িক অপশক্তির বিরুদ্ধে আমি সংগ্রাম করব। ইংরেজদের বিরুদ্ধে আমার ক্ষোভ বাড়ে। ওরা নিজেদের দেশকে অসাম্প্রদায়িক করেছে, অথচ আমাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভক্তি সৃষ্টি করে আমাদেরকে শাসন করে যাচ্ছে। ওরা চলে গেলে আমাদের নেতারা অসাম্প্রদায়িক দেশ গড়বেন, তখনও আমার সেই বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এ ঘটনার চার বছর পর, আমি যখন আজ অনেক বেশি পরিণত, আমি তার কোনও লক্ষণই দেখতে পাচ্ছি না। অথচ একদা সাম্প্রদায়িকতামুক্ত ভারতবর্ষের চায়ের দোকানের আড্ডাগুলো কত মধুর হবে তা-ও আমি কল্পনা করেছি।

"আমরা হিন্দুদের পেছন থেকে আক্রমণ না করলে পারব না," একটা ছেলে হাঁপাতে হাঁপাতে চার বছর আগের সেই পড়ন্ত বিকালে বলে।

তখন সূর্যালোকিত পশ্চিমাকাশ লাল হতে শুরু করেছে। আমার ছেলেরা মাঝে মধ্যে ঝোপঝাড়ে বাড়ি দেয়, আর ঝোপের আড়াল থেকে জোনাকি পোকা বের হয়ে আসে, দিনের আলোতে ওদের আলো দেখা যায় না। গোপালগঞ্জের কিছু রাস্তার দুই পাশে অনেক ঝোপ। ওগুলোতে নতুন পাতা ধরেছে। বাড়ি দিলে তাই নরম একটা আওয়াজ হয়। আমি খুব ঘামছিলাম। সুরেন বাবুর বাড়ির সামনে একটা খাল। খালের উপর কালভার্ট। বাড়ির ঘাটায় আমার ছেলেরা কিছু গোলাপের ঝোপ আর রজনীগন্ধ্যার ডাটায় হামলা চালায়।

ভয় পাওয়ানোতো গেলই না, বরং সুরেন বাবুর উঠানে পৌঁছে যা দেখলাম তাতে আমার মন দমে গেল। দশ-বারো জনের মতো হিন্দু লাঠিসোটা নিয়ে আমাদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা যেন আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। করারই কথা। ওরা জানত আমার বালকদল ওদের মোকাবেলা করবে।

আমার দলের এক জন পেছন থেকে আমার গেঞ্জি টেনে ধরে। পালিয়ে যাওয়া অবশ্যই বিচক্ষণতা হতো। তবে আমি ওদেরকে আমাদের ভয় দেখাতে রাজি ছিলাম না। বাহুবলই যে একমাত্র বল নয়, তত দিনে আমি তা জেনে

গেছি। আমার আব্বাকে দেখেছি ক্ষমতাশালী ইংরেজকে চোখ দিয়ে কাবু করতে। আমাকে পিছু হটতে না দেখে আমার ছেলেরা আমার চারিদিকে ঘিরে দাঁড়ায়। আমার বয়স তখন আঠারো। অন্য ছেলেগুলোর বয়স আরও কম।

"মালেককে ছেড়ে দিন," আমি হুঙ্কার ছাড়ি। "আমরা এখানে মারপিট করতে আসিনি। আমরা শুধু মালেককে নিয়ে যেতে চাই।"

এই একটা জিনিসে আমার যথেষ্ট জোর ছিল। গলার জোর। ইংরেজিতে যাকে বলে স্টেনটরিয়ান ভয়েস, আল্লাহ আমাকে সেটা দিয়েছেন। পরবর্তী সময় দেখেছি, গলা খুলে বক্তৃতা দিতে পারা রাজনীতিতে আমার জন্য আর একটা বাড়তি শক্তি হয়ে গেল। সেই আঠারো বছর বয়সেই সভাসমিতিতে আমার অনেক বক্তৃতা দেওয়া হয়ে গেছে। তখন প্রায় প্রতিদিনই সাম্প্রদায়িকতা আর ইংরেজদের বিরুদ্ধে রাস্তায় রাস্তায় মিছিল করে যাচ্ছি, ভাষণ দিচ্ছি। ফলে গলায় বেশ একটা ব্যথাও ছিল। তারপরও সুরেন বাবুর উঠানের সশস্ত্র হিন্দুরা আমার গলার আওয়াজ শুনে কিছুটা আপনা-আপনি পিছু হটল বলে মনে হলো।

অবশ্য ওদের সম্বিত ফিরে আসতেও দেরি হলো না। তখন ওরা দেখে আমরা কয়েকটা বাচ্চা ছেলে মাত্র। ওরা ওদের লাঠিসোটা দিয়ে এক সাথে আমাদের আক্রমণ করে। আমি হাতে পায়ে পিঠে ঘাড়ে বাড়ি খাই। চেষ্টা করি আমার নিজের সেগুন কাঠের লাঠিটা দিয়ে ওদের সরাতে। আমার ছেলেরা অবশ্য এর মধ্যে প্রত্যাঘাত শুরু করেছে। দুই পক্ষ একে অন্যকে পেটাতে থাকে। কতক্ষণ শুধু মনুষ্য-দেহে লাঠির আঘাতের শব্দ শুনি। এক সময় আমাদের একটা ছেলে 'ও আম্মা ও আম্মা' বলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। আমি তার আক্রমণকারীকে ঠেলে মাটিতে বসিয়ে দিই।

ব্যক্তিগতভাবে আমার লাঠি ব্যবহার করার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু ওরা আমাদের মেরেই চলেছে। আমি যেইমাত্র ছেলেটাকে মাটি থেকে তুলতে যাই সেইমাত্র একটা বেতের লাঠির বাড়ি আমার ডান বাহুতে পড়ে। বেতের বাড়ির সে কী জ্বালা। আমি এক হাত দিয়ে হিন্দুটাকে নিস্তেজ করার চেষ্টা করি। কিন্তু কিছুতেই পেরে উঠছিলাম না। "কাটাইলের বাচ্চা," মুখের উপর পোড়া দাগওয়ালা এক হিন্দু গালি দিয়ে আমার উন্মুক্ত আহত বাহুতে একটা চার কোনা কাঠের লাঠি দিয়ে আঘাত করে। সেই আঘাত আমার কপালে আর চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক হয়ে আঘাত হানে। জ্বলন্ত ব্যথা আমার আহত হাত থেকে মেরুদণ্ড পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

এভাবে মারতে থাকলে ওরা আমাদের খতম না করলেও আমরা আধমরা

হয়ে যাব। আমি আমার লাঠি দিয়ে মুখে পোড়া-দাগ-বিশিষ্ট হিন্দুটার ঘাড় চেপে ধরি। সে শক্ত হয়ে যায়। সে এটা আশা করেনি। আমি তার ঘাড়ের উপর চাপ বৃদ্ধি করি। এক সময় তার হাতের চারকোনা লাঠিটা মাটিতে পড়ে যায়।

আমার দলের একটা ছেলে লাঠি ফেলে দিয়ে এক হিন্দুর বুকের ছাতির নিচে মাথা দিয়ে ঠেসে ধরে, এক ষাঁড় যেমন করে তার শিং দিয়ে অন্য ষাঁড়কে থামানোর চেষ্টা করে। আমি বুঝলাম আমার ছেলেরা হঠকারী হয়ে উঠছে। ওরা ভয়ানক কিছু করে ফেলতে পারে। আমি হিন্দুগুলোর মর্মাহত অবস্থাও বুঝতে পারি। "এই কয়টা কাটাইলের বাচ্চার কাছে হেরে যাওয়ার চেয়ে আমাদের গলায় দড়ি দেয়া ভালো।" একটা নাদুসনুদুস হিন্দু এ কথা বলে রশিদের ঠ্যাঙে কষে একটা বাড়ি দেয়। রশিদের আর্তনাদ আমার কাছে করুণ ঠেকে। হিন্দুটা মারতে মারতে রশিদকে মাটিতে শুইয়ে ফেলে। সে রশিদের ডান ঠ্যাঙ আর বাম ঠ্যাঙে সমানে আঘাত করে চলে। আমার দলের হলুদ গেঞ্জি পরা ছেলেটা রশিদের আঘাতকারীর রান কামড়ে ধরে। লোকটা ব্যথায় কঁকিয়ে ওঠে আর দুই হাত দিয়ে লাঠিটা তার মাথার উপর তুলে ধরে। আমাদের তিনটা ছেলে কাঁদতে কাঁদতে হিন্দুগুলোকে এলোপাতাড়ি বাড়ি দিতে থাকে। আমি লাঠি দিয়ে আমার শিকারের ঘাড়ের উপর চাপ বাড়াই। কয়েক সেকেন্ড পর সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তার দুরবস্থা আর আমার ছেলেদের মরনপণ লড়াই দেখে হিন্দুগুলো ভয় পেয়ে যায়। ওরা প্রায় সকলে মারামারি থামায়, কিন্তু মুখ চালানো বাড়িয়ে দেয়। দুই পক্ষই বিদ্যুদ্বেগে গালি বিনিময় করে। বয়স কম হলেও আমার ছেলেরা অশ্লীল গালিতে যেন বয়স্ক হিন্দুগুলোর চেয়ে এক কাঠি সরেস। কাটাইল, মালাউন, আর দুই তরফের নারীদের বিপরীত তরফ থেকে সম্ভোগ আর যৌন নিপীড়ন করার অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি আর হুমকি। আমি গালিতে অংশগ্রহণ করি না।

এক সময় দুই পক্ষই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। মনে হচ্ছিল একটা কিছু সুরাহা হতে যাচ্ছে। এমন সময় পিছন থেকে রমাপদ বাবু একটা লাঠি নিয়ে আমার দিকে তেড়ে আসেন। "মিয়া ভাই," রশিদ চিৎকার করে ওঠে। আমি ঘুরে দেখি রমাপদ বাবু লাঠি দিয়ে বাড়ি তুলেছেন। ওই বাড়ি মাথায় পড়লে আমার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা তিরোহিত হতে পারত। আমার লাঠিও সাথে সাথে আকাশে উঠে যায়। আমি চেয়েছিলাম আমার রীতি অনুযায়ী রমাপদ বাবুর রানের উপর বাড়িটা দিতে, কিন্তু তা আর পারলাম না। আমি তার চেয়ে দেড় ফুট লম্বা। আমার সেগুন কাঠের লাঠি রমাপদ বাবুর করোটিতে সরাসরি শ্যাট

করে আঘাত করে।

রমাপদ বাবুর মাথা থেকে রক্ত বের হয়। একটা উষ্ণ ক্ষীণ স্রোত আমার ডান চোখের বাইরের কোনায় এসে লাগে। আমি বিহ্বল হয়ে পড়ি। কার মাথা ফাটার কথা ছিল, ফাটল কার?

সবাই থেমে যায়। পরিবেশ হয় থমথমে। রমাপদ বাবু মাথায় হাত চেপে ধরে গোঙ্গাতে থাকেন। হিন্দুগুলো রমাপদ বাবুকে ধরে নিয়ে উঠানের বাইরে চলে যায়। তারা বোধ হয় রামপদ বাবুকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে। বাকি হিন্দুরা পালিয়ে যায়। আর গোধূলিও শুরু হয়ে গিয়েছিল।

আমরা অনেক মার খেয়েছি। কিন্তু আমাদের কারও মাথা ফাটেনি। রশিদ ওর একটা ঠ্যাঙ টেনে টেনে হাঁটছিল। আমরা সুরেন বাবুর ঘরের দিকে এগিয়ে যাই। আমাদের একটা ছেলে সুরেন বাবুর পাকা ঘরের কাঠের দরজায় লাথি মারে। ছেলেটার গায়ে খুব একটা জোর ছিল না। তখন আমি কতক পদাঘাত করি। দরজার উপরের অংশ ছিটকিনি দিয়ে বন্ধ ছিল। তারপর অন্য এক জন দরজার নিচের অংশে একটা করে লাথি দেয় আর দরজাটা একটু করে ফাঁক হয়। বেশ কয়েকটা লাথি দেয়ার পর কাঠের একটা অংশ ভেঙ্গে আলাদা হয়ে যায়। আমাদের একটা ছেলে ভাঙ্গা অংশটা টেনে উঠানের দিকে ছুঁড়ে মারে। কালো শার্ট পরা আমাদের ছোট্ট খালেক বুকে ভর দিয়ে ছিদ্রটার মধ্য দিয়ে ভেতরে ঢোকে আর ভেতর থেকে ছিটকিনি খুলে দেয়।

ঘরের ভেতর প্রবেশ করে আমরা নির্বাক হয়ে যাই। মনে হচ্ছিল বাড়িতে কেউ নেই। বুঝা যায়, সুরেন বাবু কোমর বেঁধেই ষড়যন্ত্রে নেমেছেন। তাই বাড়ির নারী ও শিশুদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়েছেন। এতে সুরেন বাবুর প্রতি আমার রাগ বেড়ে যায়।

ঘরের ভিতর একটা খাট। ওখানে হয়তো তোষক ছিল। কিন্তু তাও তুলে নেয়া হয়েছে। মালেক ওই খাটের উপর শুয়ে আছে। আমাদের দেখে মালেক কেঁদে ফেলে। মালেক আগাগোড়া পাটের রশি দিয়ে বাঁধা। ওর রোদ-পোড়া চামড়া আর পাটের রশির একই রং। আমরা বাঁধন খুলে দিয়ে মালেককে দাঁড় করাতে চেষ্টা করি। পায়ের ঝিনঝিনানির জন্য মালেক দাঁড়াতে পারে না। ওকে আবার শুইয়ে দিয়ে আমাদের কয়েকজন ওর ঠ্যাঙ দুইটা মালিশ করে, পায়ের পাতায় চাপড় মারে আর পায়ের আঙ্গুলগুলো টেনে দেয়। তারপর মালেককে আবার উঠানো হয় এবং সে দাঁড়াতে পারে।

কেবল তখন আমরা সবাই গন্ধটা টের পাই। যে ছেলে দু'টি মালেকের গা মালিশ করছিল ওরা ওদের হাত কচলায়, নাক কুঁচকায়।

“ওরা আমার সারা গায়ে গোবর মেখেছে আর আমার মাথার উপর এক বালতি চনা ঢেলে দিয়েছে,” মালেক বলে।

এবার আমরা বুঝলাম গন্ধ কীসের। মালেক জানালো ওকে আর কোনও আঘাত করা হয়নি। আর আমরা যখন দরজায় আঘাত করছিলাম তখন মালেক বুঝে গেছে, ওর সাথীরা ওকে নিতে এসেছে।

“তা হলে কাঁদছিলি কেন?” আমি জিজ্ঞাসা করি।

“চেপে রাখতে পারিনি, তাই,” মালেক বলে।

আমরা উঠান দিয়ে না গিয়ে বাড়ির পেছন দিয়ে মালেককে নিয়ে বের হয়ে যাই।

যে সন্ধ্যায় হিন্দুদের হাত থেকে মালেককে উদ্ধার করি সে রাতে গোপালগঞ্জের বাড়িতে আমরা চার জন ছিলাম: আমাদের কাজের লোক হাবু শেখ, রেণু, আম্মা আর আমি। ছোট বোন আমেনার বিয়ে হয়ে গেছে। হেলেন গেছে তার বাড়িতে বেড়াতে। আব্বা নাসেরকে সাথে নিয়ে আগের দিন বিকালে টুঙ্গিপাড়া গেছেন। রেণু তখন গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলের তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে আর আমি অষ্টম শ্রেণিতে। বয়সের তুলনায় গুণে গুণে কমপক্ষে চারটা শ্রেণি পেছনে ছিলাম আমি।

সে রাতে আম্মা আর রেণু আমার জন্য কী করেছিল তা একমাত্র আমি জানি আর আমার আল্লাহ জানেন। ব্যথা আর ক্লান্তিতে মুহ্যমান অবস্থায় আমি কিছু করতে পারছিলাম না। আম্মার সাহায্য নিয়ে আমি শর্টসটা খুলে একটা পাজামা পরি। রেণু ধীরে ধীরে টেনে আমার গা থেকে জার্সিটি খোলে। রেণু অনেক সাবধান ছিল। তারপরও ডান হাতের আঘাতের জায়গাটায় মনে হলো হাড্ডি ছিলে গেছে। ঘরের মধ্যে বসন্তের আরামদায়ক শীতলতা। রেণু আলনা থেকে একটা পরিষ্কার গেঞ্জি নিয়ে আসে। রেণু আর আম্মা মিলে আমাকে গেঞ্জিটা পরায়। রেণু অনেক ধৈর্য ধরে আমার ডান হাতটা তুলে ধরে রাখে যতক্ষণ না আম্মা গেঞ্জিটা পিঠের উপর তোলে। আমার বসে থাকার শক্তি ছিল না। আমি বিছানায় শুয়ে পড়ি। রেণু আমার উপর একটা কাঁথা বিছিয়ে দেয় এমন ভাবে যেন আমার ডান হাতটা কাঁথার বাইরে থাকে। আম্মা গরম পানি দিয়ে আমার সারা গা মুছে দেন। রেণু বালতি করে কল থেকে ঠাণ্ডা পানি আনে। রেণু ওর ঘর থেকে একটা রুমাল আনে। সূতি কাপড়ের রুমালটা ঠান্ডা পানিতে ভিজিয়ে রেণু ওটা আমার ব্যথার জায়গায় নরম করে চেপে ধরে। রুমালটা গরম হলে রেণু আবার ওটা পানিতে ভিজায় আর ওটা দিয়ে আবার আঘাতের জায়গায় আস্তে করে চাপ দেয়। এক ঘণ্টা পর আমার হাতের ব্যথা কিছুটা কমে। অবশ্য আমি তখনও হাতটা নাড়াতে পারছিলাম না। ক্ষুধায় আমার পেট চিড়চিড় করছিল।

হাবু শেখ ভাত আর শিং মাছের ঝোল এনে টিপাইয়ের উপর রাখেন। আমি আম্মার সাহায্যে শরীরটাকে টেনে খাটের মাথায় হেলান দিয়ে বসি। তারা বুঝতে পারছিল আমার পক্ষে হাত দিয়ে ভাত খাওয়া সম্ভব নয়। রেণু কাঁসার থালায় ভাত আর তরকারি বাড়ে। আম্মা আমাকে ভাত খাওয়ানোর প্রস্তুতি নেন। হাবু শেখ আগ্রহ ভরে তা দেখেন। তিনি আমাদের অনেক ভালোবাসেন।

"চাচা, আপনি ঘুমাতে যান," আমি বলি।

আমরা সবাই জানি হাবু শেখ ঘুমাতে ভালোবাসেন। যে দিন উনি বারো ঘণ্টা ঘুমাতে পারেন, সে দিন ওনার জীবন ধন্য হয়ে যায়। আর সে দিন দেখলাম শুতে যেতে বলাতে হাবু শেখের মুখ ছোট হয়ে যায়। আসলে উনি আমাদের ফেলে চলে যেতে সঙ্কোচ বোধ করছিলেন।

"যান চাচা," আমি বলি। "সকাল সকাল উঠতে হবে আপনাকে।"

"বাবাজি, আমি জেগে থাকব, ভাবি সাহেবা যখন ডেকে পাঠাবেন, তখনই চলে আসব।"

তারপরও হাবু শেখ নড়েন না।

"ভাই, তুমি যাও," আম্মা বলেন।

"যখন দরকার ডাক দিবেন, ভাবি সাহেবা।"

"অবশ্যই, চাচা," আমি বলি।

যাবার সময় হাবু শেখের মুখে আতঙ্কের চাপ। পুরনো কালের মানুষ তিনি, বয়স ষাটের কম হবে না, ত্রিভুবনে তাঁর আমার আম্মা ছাড়া আর কেউ নেই।

রেণু একটা বাটিতে একটা মাছ নিয়ে ওটার কাঁটা বাছে। আমি ভয় পাচ্ছিলাম, মাছ বাছতে গিয়ে না ওর আঙ্গুলে কাঁটা বিঁধে। সে রকম কিছু হয় না। কাঁটা বেছে রেণু মাছটা আমার পাতে রাখে। তারপর হাত ধুয়ে আবার আমার হাতে জলপট্টি দিতে থাকে। রেণুকে দেখে তখন আমার একটু পরিতাপ হয়, গোধূলি বেলার মারপিটের জন্য। আমি বাম বাহু দিয়ে চোখ মুছে ফেলি। রেণু তা দেখে ফেলে।

আম্মা একটা কাঁচা মরিচ আলুর ফালির মধ্য থেকে সরিয়ে পাতের এক কোনায় রাখেন। হাবু শেখ তরকারিতে অনেক মরিচ দেন। আম্মা আমার মুখে ভাত তুলে দেন। শিং মাছের ঝোলে সিক্ত শিং মাছের মাংসে পুষ্ট এক একটা লোকমা আমার রসনা থেকে নিমেষে উধাও হয়ে যায়।

রেণু আবার ঠাণ্ডা পানি আনে। আর আমার বাহুতে জলপট্টি দেয়। আমার খাওয়া শেষ হলে রেণু যত্ন করে কাচের গেলাশে করে আমাকে পানি খাওয়ায়।

খাওয়ার পর হাতের ব্যথাটা বাড়ে। রেণু জলপট্টির দিয়ে যায়।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম খেয়াল করিনি। যতক্ষণ জেগে ছিলাম ততক্ষণ কোনও দুর্ভাবনা আমার মাথায় তেমন আসেনি। ঘুমানোর পর বুঝি মস্তিষ্ক সক্রিয় হয়ে ওঠে। আমি স্বপ্ন দেখি। আমি শ্মশানে, যার দক্ষিণ দিক দিয়ে গোপালগঞ্জের সবচেয়ে বড় খাল বয়ে যায়। খালে স্রোত আছে। খাল পাড়ে সারিবদ্ধভাবে লাগানো ফল-ভারে আক্রান্ত জামরুল গাছ। আমি দেখি পাকা জামরুলের হালকা-সবুজ আর গোলাপি রং। রমাপদ বাবুর মৃতদেহটা কাঁচা কাঠের মাচার উপর শোয়ানো। তার ছয় কি সাত বছর বয়সের ছেলে ধুতি পরে হাতে গাছের একটা কাঁচা জ্বলন্ত ডাল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখাগ্নি করার জন্য অপক্ষোরত অনাথ সন্তান অপলকে মৃত পিতার দিকে চেয়ে থাকে। আগুনের ধোঁয়ায় বৃক্ষের নির্যাসের গন্ধ। রমাপদ বাবুর ফাটা মাথা হা হয়ে আছে। কামানো মাথা। খুলির ভেতর কোনও মগজ বা ওই জাতীয় রক্তাক্ত কোনও কিছু দেখা যায় না। বরং মাথাটা ফাটা ডাবের মতো পরিষ্কার। তাতে অবশ্য আমার গায়ে আরও বেশি কাঁটা দেয়।

"বোল হরি বোল, হরি হরি বোল।"

সগর্জন ধ্বনি তুলে হিন্দুরা আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে দেন। চৈত্রের আকাশে শকুন উড়ে বেড়ায়। খালের অন্য পাড়ের ধানক্ষেতে বাতাসের আওয়াজ। তাঁরা কেউ আমাকে খেয়াল করেন না। রমাপদ বাবুর সাদা থান পরা বিধবা স্ত্রী তাঁর বুক এমনভাবে চাপড়ান যে এ ঘটনা বেশি সময় চলতে থাকলে তাঁর বুকের পাঁজরগুলো খুলে পড়বে। অনাথ বাচ্চাটা সযত্নে জ্বলন্ত কাঠ পিতার মুখে আলতো করে ধরে একটু একটু ঘুরায়। মনে হয় ছেলেটা তার পিতার ঠোঁটগুলোকে সমান ভাবে চিতার আগুনের পরশ দিতে চায়। আমার পক্ষে স্বপ্নের মধ্যে এর চেয়ে বেশি খুঁটিনাটি দেখা সম্ভব হয় না। কিছুক্ষণ পর দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠা আগুন রমাপদ বাবুর দেহকে ঘিরে ফেলে। চারিদিকে বসন্তের বাতাসের নাচন। আমি কবিগুরুর চোখে রমাপদ বাবুর দাহ দেখি।

আমার এ দেহখানি তুলে ধরো।

তোমার ওই দেবালয়ের প্রদীপ করো।

আমি রমাপদ বাবুর পুড়ন্ত চামড়ার গন্ধের সন্ধান করি, কিন্তু বাতাসে তার লেশমাত্র নাই। যেন কবিতার শুধায় সব ভেসে গেছে।

আমি খেয়াল করেছি, স্বপ্নের মধ্যে স্বাদ, গন্ধ, ব্যথা সবই ভোতা হয়ে যায়, তীক্ষ্ণ হয় শুধু ভয়ের অনুভূতি। যখন চিতায় আর হিন্দুগুলোর কোনও কাজ অবশিষ্ট থাকে না, তখন তাঁদের চোখ পড়ে আমার উপর। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করি পালানোর জন্য। তাতে আমি শুধু একটা মাটির পুতুলের মতো এ দিক ও দিক হেলতে পারি। আমি আমার পা নাড়াতে পারি না। তারপরও আমি সর্বশক্তি নিয়োগ করি পা দু'টিকে সামনের দিকে ঠেলতে। তখন খেয়াল হয় আমার পা খালি আর তার নিচে মাটি নাই, আছে শেওলা পড়া এক পিচ্ছিল পাথর, একটা খোলা ছাতার সমান বড়। তখন নড়তেও ভয় হয়। যদি পড়ে যাই। তাঁরা আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। সবাই আমাকে ধরে তাঁদের মাথার উপর তোলেন। আমি বুঝতে পারছি তাঁরা কী করতে যাচ্ছেন। তাঁদের থামানোর আমার কোনও শক্তি নাই। তাঁরা আমাকে পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছেন। ইহকাল ছেড়ে আমি পরকালের দুয়ারে। যেখানে আমাকে চিরকাল থাকতে হবে। দুঃখ-বেদনায় মন ভরে যায়।

হিন্দুরা আমাকে রমাপদ বাবুর জ্বলন্ত শবের উপর ছুঁড়ে ফেলেন। আমি ইহজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। যে আগুন রমাপদ বাবুকে গিলছে সে আগুন আমাকে ঘিরে ধরে। আমি হাল ছেড়ে দিই।

আমি রমাপদ বাবুর জ্বলন্ত মৃতদেহের উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছি। আগুনে তেজ নাই, আর রমাপদ বাবুও পরিষ্কার আর পরিপাটি, সাদা থানে মোড়ানো। তাঁর হাত দুটি বের হয়ে আছে। তবে উনি পুড়ে যাচ্ছেন। উত্তাপবিহীন আগুনে মানুষের পুড়ে যাওয়া দেখে আমি বিহ্বল হই। আমি মৃত রমাপদ বাবুর প্রতি মমতা অনুভব করি।

আমার ভয় কমতে থাকে। কারণ আমি আগুনে পুড়ছি না, যদিও অগ্নিশিখা ছলাৎ ছলাৎ করে আমাকে আঘাত করে। রমাপদ বাবু আমাকে জড়িয়ে ধরেন। তাঁকে আমার আপন মনে হয়। মরে যেন তিনি আরও বেঁটে হয়ে গেছেন।

"মজিবর," তিনি বলেন। "আমি ভুল করেছিলাম। মুসলমানদের ঘৃণা করে কী লাভ হলো। জ্বলেতো বাষ্প হয়ে যাচ্ছি। আরতো ফিরব না।"

রমাপদ বাবু আমার মনের কথা বললেন। কী যে ভালোবাসলাম তাঁকে। মানুষের একটুখানি উদারতা দেখলেই আমার চোখে পানি আসে। আর তখন আমি অঝোরে কাঁদছিলাম। যদি কোনওভাবে রমাপদ বাবুর জীবন ফিরিয়ে দেওয়া যেত। আমার এই বাইশ বছরের জীবনে আল্লাহর কাছে কখনও কিছু এত গভীরভাবে চাইনি, সে রাতে স্বপ্নের মধ্যে যে ভাবে রমাপদ বাবুর জীবন

ভিক্ষা চেয়েছিলাম। কারণ এটা তখন পরিষ্কার হয়ে গেছে, রমাপদ বাবু চিতার আগুন থেকে উঠতে পারলে আর কখনও সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ছড়াবেন না।

আমি বার বার আল্লাহকে বলতে থাকি, হে আল্লাহ, আপনি তাঁকে জীবন দান করেন। মাওলা, আপনার পক্ষেতো সবই সম্ভব। আপনি চাইলে পাহাড় সাগরে চলে যাবে, সাগর পাহাড়ের যায়গায় চলে আসবে। হে মা'বুদ, যে মানুষ তার ভুল বুঝতে পেরেছে, তাকে আপনি আমাদের মাঝে ফিরিয়ে দিন।

আমার বোঝা উচিত ছিল, আল্লাহ যে মৃত ব্যক্তিকে পৃথিবীতে জীবিত করবেন না, তা আল্লাহই বলে রেখেছেন। স্বপ্নের মধ্যে যদিও আমার নিজের উপর নিজের কর্তৃত্ব ছিল না। আমি দুঃখ-ভারাক্রান্ত চিত্তে আমার নিষ্ফল আহাজারি খেয়াল করি। রমাপদ বাবু ধীরে ধীরে নিরুত্তাপ আগুনে বাষ্প হয়ে যাচ্ছেন। তাঁর হাত দুটো এখন আর আমার পিঠের উপর নাই। আমি আমার নিজের বিপদের কথা ভাবছি না। আমি ভাবছি তাঁর নাবালক পুত্র আর অসহায় বিধবার কথা। তাঁদের কী হবে? আমার মনে রমাপদ বাবুর রেখে যাওয়া প্রশ্ন। কেন মানুষ মানুষকে ধর্মের বিভেদের জন্য ঘৃণা করে?

এক সময় মাচার উপর আমি ছাড়া আর কেউ নাই। রমাপদ বাবু নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন। আর পোড়া চন্দনের গন্ধ আমার নাকে লেগে আছে।

"কাঁদছেন কেন?"

আমি বুঝলাম না কে কথা বলল। এমন শান্ত মধুর কণ্ঠ আগে কখনও শুনিনি। আমার চোখে জল, সেটা বুঝতে পারছি। আমার বুকে রমাপদ বাবুর জন্য ভালোবাসা। আমার আঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এমন দুঃসময়ে কে আমার কানে শব্দ দু'টি পৌঁছে দিল? যা আমাকে রমাপদ বাবুকেও ভুলিয়ে দিল।

আমি কান খাড়া করে থাকি। কিন্তু কেউ কথা বলে না। ভাবি, একটু অপেক্ষা করে দেখি। অপেক্ষার পালা আর শেষ হয় না। কারও কোনও শব্দ নেই। মনে হল, আমি তখনও স্বপ্ন দেখছি।

স্বপ্ন হোক আর জাগরণ হোক। আমি ওই কথাটা আবার শুনতে চাই। অন্তত একটি বারের জন্য।

কিন্তু কেউ কথা বলে না। আপদের দিন। হয়তো বা আমি হ্যালুচিনেশনের শিকার। তারপরও আমার আকাঙ্ক্ষা কমে না। আমি সেই শীতল কণ্ঠ ভুলতে পারছিলাম না।

মনে হয় কেউ কথা বলেনি। তা হলে কী শুনলাম? যদি হ্যালুচিনেশন হয়ে থাকে, তবে তা-ই আর এক বার হোক। আমি কথাটা আর এক বার শুনি।

কিন্তু না, আমি তা শুনি না। আর সে জন্য আমার আফসোস হয়। রমাপদ বাবু মারা গেছেন, সন্দেহ নাই। ওঁরা নিশ্চয়ই দেখেছে আঘাত গভীর ছিল। তাই বুঝি তাঁরা তাঁকে এমন করে হাসপাতালে নিয়ে গেল আর সুরেন ব্যানার্জির বাড়ি খালি হয়ে গেল আর আমরা কোনও প্রতিরোধ মোকাবেল না

করেই মালেককে উদ্ধার করতে পারলাম। আমি লাঠি তুলেছিলাম ওনার রানে আঘাত করার জন্য। তা যখন ওনার করোটিতে পড়ে, তখন তা বেশ জোরেই লেগেছিল, স্বপ্নেতো দেখলাম খুলিটা প্রায় দুই ভাগ হয়ে কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌঁছেছে। পায়ে লাগলে ওই আঘাত এত শক্ত হতো না। বিপদে পড়ে গেলাম। যে কাজ আমি ভালোবাসি, যে কাজে আমি মনপ্রাণ ঢেলে দিতাম, তা বুঝি আর করা হবে না। না হোক। যদি আর এক বার শুধু ওই কণ্ঠটা শুনতে পেতাম।

কই? বেহেশত থেকে শব্দ দু'টি আর ভেসে আসে না। এ দিকে ধীরে ধীরে আতঙ্ক আমাকে গ্রাস করতে থাকে। কী হবে এখন? পুলিশ আসবে। আমাকে নিয়ে যাবে। বিচার হবে। ফাঁসি হবে।

আমি শাস্তি পেতে যাচ্ছি। কিন্তু কেন? আমি কি আমার সীমা অতিক্রম করেছিলাম? দারোগা সাহেবের কথা মনে পড়ে। আব্বার কথা চিন্তা করতে গিয়ে গাল গরম হয়ে যায়। আব্বার নীরব সম্মতি ছিল আমার কাজের প্রতি। তিনি এমনকি আমাকে ব্যারিস্টার বানানোর বাসনাটাও ধীরে ধীরে ত্যাগ করছিলেন। আম্মা আর রেণুর জন্য খারাপ লাগছিল। কিছুতেই ফাঁসির কথা ভাবতে পারছিলাম না। এই বয়সে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব? আপনজনদের ছেড়ে। তা হলে চৌদ্দ বছর বয়সে চলে গেলেইতো হতো। বেরিবেরি রোগের সময়। অন্তত রেণুর জন্য তা অনেক বেশি ভাল হতো।

আমি রমাপদ বাবুকে খুন করতে চাইনি। অথচ তিনি খুন হয়ে গেলেন। আমি নিজেকে প্রশ্ন করি। আমার কতটা অনুতপ্ত হওয়া উচিত? ক্ষুদিরাম, সূর্য সেন, এঁরাওতো ফাঁসির দড়িতে ঝুলেছেন। আমার আসন্ন ফাঁসির সাথে তাঁদের ফাঁসির তফাৎ কোথায়। আমরা সবাই স্বাধীনতা চাই। ক্ষুদিরাম আর সূর্য সেন নিশ্চয়ই আমার জায়গায় থাকলে একই কাজ করতেন। সাম্প্রদায়িক মানুষগুলোর বিরুদ্ধে লড়তেন। আমি নিজেকে কর্তব্যপরায়ণ হিসাবেই দেখি। মানুষ আমাকে চিনবে না, মনে রাখবে না, এ কথা ঠিক। কিন্তু আমিতো আমাকে চিনলাম। এটাই বা কম কি? আমি যা করেছি, তা এই গোপালগঞ্জবাসিকে শান্তিতে রাখার জন্য করেছি। অকালে আমাকে নিবৃত্ত হতে হলো। দেশের জন্য কিছু করা হলো না। অথচ করার অনেক কিছু ছিল। রাত দিন পাহারা না দিলে এ দেশ থেকে সাম্প্রদায়িকতার বিষ কোনও দিন ছেড়ে যাবে না। এমন দুঃখের দেশে কাজ করার কত সুযোগ। অসাম্প্রদায়িক একটা দেশ দেখার বড় শখ ছিল। তা বুঝি আর হলো না।

তারপরও একটা ভরসা বুকের মধ্যে ছিল। আমি মগজে সে শান্তি অনুভব করি। আমার মৃত্যু ভয় নেই। তা চার বছর আগেই চলে গেছে।

আমার মনে আশার মতো কিছু একটা উঁকি দেয়। আমি নিজেকে প্রশ্ন করি, আচ্ছা ফাঁসি কি হবে? আমিতো তাঁকে খুন করতে চাইনি। আর যদি প্রমাণ হয় খুন করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, তা হলেতো বিকল্প সাজাও হতে পারে। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড –চৌদ্দ বছরের জেল।

এত দীর্ঘ সময় ধরে জেল খাটার বিষয়টা মেনে নিতে পারছিলাম না। তবুও দুই বিকল্পের মধ্যে যাবজ্জীবনটাকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছিলাম। কারণ ওটা হবে মন্দের ভালো। তবে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়টা কর্মহীন আর নিঃসঙ্গ কাটবে। নিঃসঙ্গতার ভয় আমার উপর ভর করে। আমার বুকের পাঁজর শক্ত হয়। আর ফুসফুস দু'টি বুঝি বসে গেছে। আমি নিশ্বাস বন্ধ হওয়ার কষ্ট পাই।

সবচেয়ে বেশি খারাপ লাগছিল রেণুর জন্য। আমি জেলে অলস সময় কাটাব আর রেণু একা একা বড় হবে। হতাশায় আমার মাথার তালু জ্বলে। গায়ে ঘাম হয়। জেল থেকে বের হওয়ার আগেই আব্বা আম্মা মরে যাবেন। মুক্ত পৃথিবীতে এসে দেখব আমার সব শেষ।

"কী হয়েছে আপনার?"

আবার সেই শান্ত মধুর কণ্ঠ। এবার তা আর হ্যালুচিনেশন মনে হয় না। তবে কথাগুলো যেন পৃথিবীর অন্য প্রান্ত থেকে ভেসে এল।

যা ভাবছি, তা কি সত্যি?

আরামে আমার শরীর হালকা হয়। পিঠ ও ঘাড়ের মাংসপেশিগুলোর যেখানে যত গিঁট আর টান ছিল সব বুঝি এক নিমেষে খুলে যায়। এমনকি আমার ডান হাতের আহত স্থানের পেশিটাতেও শিথিলতা অনুভব করি।

আমার ধারণা ঠিক। তবে রেণু যে সব সময় আমার শিয়রের কাছে বসে থাকবে, এমন ভাবনা মাথায় আসার কথা নয়। সুরেন ব্যানার্জির বাড়িতে মার খেয়ে না আসলে সন্ধ্যার পর রেণুর হাতের ওই সেবা আমি পেতাম না। পরিস্থিতি ওকে বাধ্য করেছে। আমি ধরে নিয়েছিলাম, আমি ঘুমানোর পর রেণুও ওর ঘরে ঘুমোতে গেছে। আমি ধরে নিয়েছিলাম, আম্মা থাকবেন আমার পাশে। এখন দেখছি, উল্টোটা। আমি ঘরে শুধু রেণুর উপস্থিতি টের পাই।

রেণুকে যদি আমি খেয়াল করতামও, যা শুনলাম তা যে রেণুরই কণ্ঠ, তা

সহসা আমি ধরতে পারতাম না। কারণ, যা শুনলাম, তা এক নতুন কণ্ঠ, নতুন সুর, নতুন ব্যথা, নতুন দ্যোতনা। শুধু আমিই নই, রেণুও যেন চির দিনের জন্য বদলে গেল।

যদি কখনও পারি, আমার সে রাতের ঘটনাগুলো লিপিবদ্ধ করব। এই জন্য যে, এমন আচানক ঘটনা মানুষের জীবনে কদাচ ঘটে। তবে সে রাতে আমি শুধু এটুকু যত্ন করছিলাম: যাতে ওই অভূতপূর্ব অনুভূতির রেশটা সহসা কেটে না যায়। তখন আমার মনে হয়েছিল ওই সুখানুভূতি নিয়ে সারা জীবন কাটিয়ে দেয়া যায়। আমি তা ধরে রাখার জন্য এত আকুল যে, আমি রেণুর দিকে তাকাই না, পাছে যদি বাস্তব জীবন, মশামাছি, কিংবা হাবু শেখের নাকের ডাক আমাকে সজাগ করে, আমার হাতের ব্যথা ফিরিয়ে আনে, নিয়ে আসে ফাঁসির দড়ির দুঃস্বপ্ন কিংবা জেলখানার লোহার রডের জানালার ছবি।

আমার আকুলতায় কাজ হয় না। সুখ মন থেকে চলে না গেলেও আবেশটা স্থায়ী হলো না। ডান হাতের ব্যথার জায়গাটায় জলপট্টির আলতো ছোঁয়া। বুঝলাম রেণু শুধু আমার শিয়রের কাছে বসেই থাকেনি, জলচৌকিতে বসে সে সারাটা সময় আমার ব্যথা সারানোর চেষ্টা করে গেছে।

আমার তখন একটাই চাওয়া। আমার স্বপ্ন যেন মিথ্যা হয়। রমাপদ বাবু যেন বেঁচে থাকেন।

"এখন আর ব্যথা করছে না, রেণু," আমি বলি। "আর পট্টি দিতে হবে না।"

কিন্তু আমি বলি না, "রেণু, তুমি ঘুমাতে যাও।"

আমি তা বলতে পারি না। অনুশোচনা আমার বুকে লাফালাফি করে। আমি ভাবছিলাম, যদি ফাঁসি না-ও হয়, তারপরও আগামী চৌদ্দ বছর রেণুকে আর দেখব না।

জীবনে প্রথম এমনটা হলো। মনে হচ্ছিল সুখ আমার দেহ থেকে বের হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে। আর আমার সুখ বেড়ে যাচ্ছে। আমি জানি ওই সুখ বেশিক্ষণ থাকবে না। প্রথমে কে আসবে সেটাই দেখার বিষয়। আব্বা না পুলিশ? ততক্ষণে রেণুর সাথে কিছু কথা সেরে রাখতে চেয়েছিলাম। উদ্বেগের কারণে তাতে একটু তড়িঘড়ি হয়ে যায়।

"রেণু, লোকটা যদি মরে যায়, আমি জেলে যাব।"

"জানি।"

"তুমি কি করবে তখন, রেণু?"

"আপনি বলেন।"

ব্যথায় আমার বুক ভেঙে যেতে চায়। দুঃখ আমাকে কাঁপিয়ে দিয়ে যায়। রেণুর মুখের কথা শুনে বোঝার কোনও উপায় নাই, ওর বয়স মাত্র আট বছর। সে জন্য আমার মনের ব্যথা আরও বাড়ে।

রেণু এর মধ্যে অনেক গল্প আর উপন্যাস পড়ে ফেলেছে। *দত্তা* উপন্যাসটা পড়েছে কয়েকবার। আমি ভাবতাম এত অল্প বয়সে রেণু কী করে এতগুলো বই পড়ে ফেলল। কী ওর তাড়না? এর অন্তর্নিহিত কোনও তাৎপর্য নিশ্চয়ই আছে।

তিন বছর বয়স থেকে রেণু আমাকে 'তুমি' সম্বোধন করে এসেছে। আজ সে আমাকে 'আপনি' বলল। এমন এক রাতে, যখন আমার জীবনটা

ওলটপালট হওয়ার অপেক্ষায় এক একটা মুহূর্ত গুনে চলেছে। ভাষার জ্ঞানের দীনতা সত্ত্বেও, পরবর্তী সময় বইপত্র পড়ে অল্প-বিস্তর যা কিছু শিখেছি, তা থেকে হয়তো আমার সে রাতের অনুভবের দুই-একটা তুলনা টানা সম্ভব। আমার বিশ্বাস আমার সেই রাতের অনুভূতিকে বোধি লাভের পর বুদ্ধের অনুভূতির সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

আমি নিশ্চিত ছিলাম এমন অনুভব জীবনে আর পাব না। রমাপদ বাবু মরে গেছেন। ফাঁসি বা জেল, একটা আমার হবেই। ঠিক করি, রেণুকে আমার মধ্যে বিলীন করে জীবনের বাকি সময়টা, গর্তে হোক, নর্দমায় হোক, গরাদে হোক, কাটিয়ে দেব। ফাঁসি হলেতো ল্যাঠা চুকে গেল। আমি হব ধূলা আর জল। বাতাসে বেড়াব কিংবা সাগরের ঘূর্ণিতে আছাড় খাবো। মিশে যাবো রেণুর নির্যাসে। আর যদি জেল হয়, রেণু থাকবে আমার শিরায় শিরায়। মৃত্যুতেও অনুশোচনা নেই।

রেণুর হাতের পরশে আমার ধ্যান ভগ্ন হয়। রেণু আমার পাশে দাঁড়িয়ে। আমার মাথার উপর রেণুর হাত। রেণুর উপর আমার চোখ থেকে ভিন্ন এক আলো বিচ্ছুরিত হয়। ত্রস্ত হয়ে বাম হাত দিয়ে আমি রেণুর হাতটা চেপে ধরি। বুঝি তা আমার অবলম্বন। বুঝি রেণু সব কিছু থেকে আমাকে উদ্ধার করবে। বড় ঐকান্তিক আমি। আমার হাতের তালু ঘামছে। আমি রেণুর হাত ভিজিয়ে দিচ্ছি। তারপর খেয়াল হয় আমি এত জোরে ওর হাত চেপে ধরেছি, ও ব্যথা পাচ্ছে। কিন্তু ও কিছু বলছে না। আমি বাঁধন শিথিল করি, যদিও ওর হাতখানা ছেড়ে দেয়ার সাহস পাই না। গত পাঁচ বছর ধরে ভেবে এসেছি, আমি বিবাহিত, আমার পরিবার আছে। আর এখন? মরণে সব শেষ হতে চলেছে। জীবনের এত অল্প অভিজ্ঞতা নিয়ে জীবনের শেষ প্রান্তে চলে এলাম। সব শেষ। আট বছরের রেণু বিধবা হবে।

মাথাটা বাম দিকে কাত করি। আর আম্মাকে দেখি। আম্মা নামাজ পড়ছেন। আম্মার উপর আমার অভিমান হয়েছিল। কিন্তু আমি ভুল ছিলাম। আর জননী-ও যে এ ঘরে রয়ে গেছেন, তা জেনে আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছিল। আমি আহত হয়ে ঘরে আসার পর আমার আম্মা কোনও কথা বলেছেন কি না, তা আমার মনে নেই। আমার আম্মা আমার আব্বার মতো গুরুগম্ভীর স্বভাবের মানুষ নন। এখন আমি বুঝলাম। জননী আমার বিপদ সবার আগেই আঁচ করতে পেরেছিলেন। তাই বুঝি কোনও কিছুতে তিনি মন বসাতে পারছিলেন না। আম্মাকে প্রার্থনারত দেখে আমার তা-ই মনে হল। শুধু প্রার্থনায় তাঁর মন। প্রার্থনা করে ছেলেকে তিনি এক বার মৃত্যুর কোল থেকে টেনে তুলেছেন, এক বার অন্ধ হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচিয়েছেন। এখন তিনি আর এক বার ছেলেকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহর কাছে হাত তুলেছেন। এমন ভালোবাসা ঘরে রেখে সবাইকে ছেড়ে আমাকে চলে যেতে হবে? বার বার আমার কানে রেণুর কণ্ঠ বেজে যায়, "আপনি বলেন। আপনি বলেন।"

রেণুর নির্ভীক সত্তা আমাকে আপ্লুত করে। জননী প্রার্থনরত। রেণু আমার আহত হাতে জলপট্টি দিয়ে যায়। আর একটা মায়ার ঢেউ আমার হৃদয় থেকে উপচে পড়ে। তাকিয়ে দেখি ঘরে পাটি বিছানো হয়েছে। আমি যখন দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম, রেণু আর আম্মা তখন এ ব্যবস্থা করেছে।

আম্মা মুনাজাত শেষে আমার মাথায় দোয়া পড়ে ফুঁ দিতে থাকেন। রাত দুটা কি তিনটা হবে।

"আমার আর ব্যথা নাই," আমি বলি। "আম্মা আপনি ঘুমাতে যান। রেণু, তুমিও।"

রেণু চেয়ারে বসে থাকে। আম্মা পাটিতে। কেউ নড়ে না। তারা আমার কথা শুনবে না। আমি যে কত ভালোবাসি এদের। কত ভালোবাসি আমার আব্বাকে। আমার ভাইবোনদের।

রেণুই বুঝি আমার মুক্তির দুয়ার। সব কিছুকে যেন ওর অদৃশ্য শক্তি চারিদিক থেকে টেনে হালকা করে রেখেছে। রেণু যেন জগতের সকল রেণুর সমাহার। পৃথিবীর কোথাও কোনও ফুলে আর কোনও রেণু নাই। সবগুলো আজ আমার ঘরে। আমি রেণুর মেঘে ভেসে বেড়াই। এত মগ্ন হয়ে যে, কোনও কিছু নিয়েই আমার মনে আর হতাশা নাই। এ এক অনাবিল প্রশান্তি যা আমি জীবনে মাত্র আর এক বার পেয়েছিলাম, যে দিন হত-চেতনা ফিরে পেয়ে বুঝলাম, আমার মৃত্যুভয় চলে গেছে। মনে হলো, এ সুখের পর ফাঁসি হলে হবে। ফাঁসির দড়ি গলায় নেয়ার আগে রেণুকে স্মরণ করব। রেণু যে কী অনড় থাকতে পারে। ওর স্থিরতার শান্তি অতল সমুদ্র হয়ে আমাকে ডুবিয়ে রাখে। যে মানুষ জীবনে এক মুহূর্তের জন্যও এ সুখ পেয়েছে, তার আর পৃথিবীতে কী চাওয়ার থাকতে পারে? বিনয় আর কৃতজ্ঞতায় আমার গলাটা সঙ্কুচিত হয়। আমার মাথা সর্বশক্তিমানের কাছে নত হতে চায়।

আমি উপলব্ধি করি, সুখের পরম মুহূর্তে মানুষ মৃত্যু কিংবা বিপদের ভয় ভুলে যায়। মানুষ তখন বর্তমানে বাস করে। পর্বত চূড়া থেকে পড়ে যাওয়া কিংবা বাঘের সামনে দাঁড়ানো মানুষও বর্তমানের মধ্যে বাস করে। মানুষের সারা জীবনে কখনও কোনও সুখ না থাকলেও, শুধু মৃত্যুর সময় যদি তার সুখ থাকে, তবে সে শান্তিতে মরে। জীবনে নিরাশ হওয়ার জন্য যত জিনিস আছে, প্রেরণার জন্য আছে তার চেয়ে অনেক বেশি। আমাদের দরকার শুধু ওই জিনিসগুলিকে খুঁজে বের করা।

আর আমার সৌভাগ্য যে আমি না খুঁজেই রেণুকে পেয়েছি। আবার রমাপদ বাবুর মৃত্যুতে তাকে হারাতেও বসেছি। রেণুর শক্তিকে বুঝি আমার জীবনে আর কাজে লাগানো হবে না। আসন্ন মৃত্যুদণ্ড আমার কাছ থেকে কী কেড়ে নিতে যাচ্ছে তা আমি বুঝতে পারি। তারপরও মনে হয় না জীবন আমার অপূর্ণ রয়ে গেছে।

"বললেন না যে?"

রেণুর কণ্ঠে বেদনার দ্যোতনা। আমি কিছু উত্তর দিতে পারি না। তবে আমি কান খাড়া করে রাখি। শিরদাঁড়াও খাড়া। কারণ আমি জানি, প্রশ্নটা আবার আসবে। আর তার জন্য আমাকে বেশি সময় অপেক্ষা করতে হয় না।

"বললেন না যে?"

"কী, রেণু?"

"আপনার কী শাস্তি হবে?"

"জানি না, রেণু। হয় ফাঁসি, নয় চৌদ্দ বছরের জেল, দুইটার একটা।"

"আপনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি কী করব তখন। তারপর আপনি আর কিছু বললেন না।"

আমার বুক থেকে একটা তপ্ত নিশ্বাস বের হয়ে যায়। আমি আনন্দে বিভোর ছিলাম। তাই এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটায় মনোযোগ দিতে পারিনি। জীবনের এই কঠিন দিকটার মুখোমুখি এত অল্প বয়সে হতে হবে, তাও বুঝতে পারিনি। আমি সব কিছুর শুধু ইতিবাচক দিকগুলি ভেবে এসেছি। দেশের কাজে নেমে হয়তো প্রত্যেক মানুষই এমন প্রশ্নের সম্মুখীন হন। আপনজনদের কাছ থেকে। অনেকে তাই পরিবার ত্যাগ করেন। অনেকে পরিবারের ধারেকাছে ঘেঁসেন না। অনেকে রাতের বেলায় পরিবারের সদস্যদের ঘুমন্ত অবস্থায় খুন করেন। স্ত্রী-সন্তানদের উপর গুলি চালান কিংবা তাঁদের গলা কাটেন। দেশের কাজ তাঁদের নেশা।

আমি নেশাগ্রস্ত হতে চাই না। আমি শুধু আমার কর্তব্য করে যেতে চাই।

আমার আশা আমার পরিবার আমার জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করবে। কিন্তু আমি তাঁদের ছেড়ে যাব না। এই ছিল আমার প্রতিজ্ঞা। রামপদ বাবুর মৃত্যু একটা মীমাংসা হয়ত করে দিয়েছে। আগামী কালের মধ্যে তার স্বরূপটা জানা যাবে।

সবচেয়ে অবাক করার বিষয় হল, রেণু কথাগুলি বলছিল আমার আম্মার উপস্থিতিতে। এই বয়সেও কতটা জড়তাহীন রেণু আমার আম্মার কাছে। আর আম্মাও কিছুই বলছেন না। আমি রমাপদ বাবুর চিতার আগুনে পুড়ে স্বপ্ন থেকে জেগেছি। আমার জগৎ বদলে গেছে। আম্মা আবার নামাজ ধরেছেন।

"কিছু বলবেন না?"

আমি চোখ বন্ধ করে অশ্রু রোধ করার চেষ্টা করি।

"আমার আব্বার কথা মনে আছে," রেণু বলে। "আমি তাকে জড়িয়ে ধরে থাকতাম সারা দিন।"

রেণুর তিন বছর বয়সের কথা মনে আছে, এতে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই। আমি যদি দুই বছর বয়স থেকে আমার জীবনের ঘটে যাওয়া সব কিছু মনে রাখতে পারি, রেণুরতো এক বছর বয়সের কথাও মনে থাকার কথা। না, শুধু তা-ই নয়। রেণু যদি আমাকে ওর মায়ের গর্ভে থাকা অবস্থায়ও পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া কোনও ঘটনা খুলে বলে, আমি তা বিশ্বাস করব। বিশ্বাস করার কারণ আছে, তাই বিশ্বাস করব। রেণুতো আমার চোখের সামনে বড় হলো।

"আব্বাকে আঁকড়ে ধরে থাকতাম," রেণু বলে। "এ ছাড়া আমার আর কিছু মনে নাই।"

আমি যখন অনেক ছোট, চার কি পাঁচ বছর-এর, তখন আমার জহুর চাচা, মানে রেণুর আব্বা, তাঁর সাথে আমার অনেক সখ্য হয়। উনি বাড়ি আসলে কখনও বা পুকুরে, কখনও বাইগারে বড়শি ফেলতেন। আমরা কিছু ছেলে ওনার সাথে থাকতাম। আমি মাছের টোপ বহন করতাম। ওনার সাথে মাছ নিয়ে ঘরে আসতাম। কিছু মাছ উনি নিতেন। কিছু মাছ আমাদের দিতেন। কিছু মাছ আমার চাচিদের দিতেন। রেণুর বোনের জন্মের পর আমি আর জহুর চাচার সাহচর্য পাইনি। আর রেণুর জন্মের পর উনি বাড়ি আসলেও আমরা ছেলেরা ওনার থেকে দূরে দূরে থাকতাম। জহুর চাচা সারা দিন তাঁর দুই মেয়েকে নিয়ে ঘোরাঘোরি করতেন। ওই দৃশ্যগুলো আমার চোখের উপর ভেসে আসে।

"আমি বুঝতে পারছি, রেণু," আমি বলি। "আমি তোমার সব কথা বুঝতে পারছি।"

আমি চোখ খুলি না। আমি জানি চোখ খুললে কী হবে।

"আপনি কিছু বুঝতে পারছেন না," রেণু বলে।

"তাহলে তুমি আমাকে বুঝিয়ে বলো।"

"তারপর আব্বা চলে গেল। আর এখন আপনি চলে যাচ্ছেন।"

চোখের পানি আর ধরে রাখতে পারলাম না। ধরে রাখতে চাইও না। আসলেই আমি রেণুকে বুঝতে পারিনি। আমি ভাবছিলাম এক, রেণু ভাবছিল অন্য কিছু। এখন অশ্রু দিয়ে তার শোধ দিচ্ছি। যদিও দেয়ার আমার কিছুই নাই।

রেণুর চোখে অশ্রু। আমার তা বুঝতে দেরি হয়েছিল, কারণ রেণু কাঁদছিল শুধু চোখ দিয়ে। ওর অবশিষ্ট দেহ অবিচল। তার জন্য বুঝি অশ্রুর ধারা এমন প্রবল। আমি তাকিয়ে দেখছি। অসহায় আমি। কিছুই করতে পারছি না।

এক সময় একটা ছোট ঢেউ উঠার মতো করে রেণুর পিঠটা কেঁপে ওঠে। একটা অস্ফুট স্বর।

"আপনার ফাঁসি হবে।"

রেণুকে আমি বিকল্প সাজাটার কথাও বলেছিলাম। কিন্তু ও শুধু ফাঁসির কথাটাই ভেবে চলেছে। যদি সংগ্রামেই নামলাম, তা হলে এত সহজে ভাঙব কেন? কী করার আছে জানি না? তবে কিছু একটা করব। সে যত বড় অঘটনই হোক না কেন। রেণুকে এই দুঃখের মধ্যে আমি ফেলব না। কিছুতেই না। যদিও আমি জানি না, কী করে আমি তা করব। তবে আমাকে কিছু একটা করতেই হবে।

"আমি মরব না, রেণু।"

"আপনি মরবেন। আব্বা মরে গেছে। দাদা মরে গেছে। সবাই মরে গেছে।"

রেণুর মেরুদণ্ড আবার বাঁকা হয়। কান্না ওকে সোজা হতে দিচ্ছে না।

আমি বুক ভরে শ্বাস নিই। না হলে গলা দিয়ে কথা বের হত না।

"রেণু," আমি বলি, "যে করেই হোক, আমি বেঁচে থাকব।"

"আপনাকে ওরা ফাঁসি দিবে।"

"এখনই তা বলা যাচ্ছে না, রেণু। রমাপদ বাবুতো বেঁচেও থাকতে পারেন।"

"সে বেঁচে নাই।" রেণু আর নিজেকে সংবরণ করতে পারে না। ওর পিঠে একটার পর একটা ঢেউ উঠে।

"মরে যাওয়ার পর আব্বাকে আমি দেখিনি। যদি ওরা আব্বাকে বাড়ি নিয়ে আসত। বা আব্বা বাড়িতে মারা যেত।"

"তা হলে?"

"আব্বাকে না দেখার কথা মনে হলে আমার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। যদি তাকে মৃত দেখতাম।"

তাইতো। আমারও বুঝি বুকের ভিতর কী একটা আটকে যায়। আমারও ক্ষণিকের জন্য নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। আমিও জহুর চাচাকে শেষ দেখা দেখিনি।

রেণু চোখ তুলে আমার দিকে চায়। "আপনাকে ফাঁসি দেয়ার পর আমি কি আপনাকে দেখতে পাব?"

হারিকেনের আলোয় রেণুর অপলক কটাক্ষবাণ আমার বুকে লাগে।

"আমি আব্বার মৃতদেহের কথা অনেক কল্পনা করি," রেণু বলে। "যদি শুধু একবার দেখতে পেতাম।"

"গল্প পড়ে তোমার এ অবস্থা হয়েছে, রেণু। চাচা যখন মারা যান তখন তোমার বয়স মাত্র তিন।"

"আপনি বুঝবেন না।"

"আমার যদি ফাঁসি হয়, তারা মৃতদেহ ফেরত দেবে। তখন তুমি আমাকে দেখতে পাবে।"

রেণু একটা নিশ্বাস ফেলে। যেন স্বস্তির নিশ্বাস।

"আমি তোমার জন্য বেঁচে থাকব, রেণু।"

"আপনি পারবেন না। আপনাকে ওরা ফাঁসি দিবে।"

বুঝলাম, আমি ওর বিশ্বাস ভাঙতে পারব না। আমার দম আর এক বার বন্ধ হয়। যদি বেঁচে যাই, কোন্ সুখে জীবন কাটবে, আমি তা ভাবতে থাকি। রেণুকে মাটিতে রেখে কবরে যেতে হবে, এর চেয়ে অনুশোচনার আর কী থাকতে পারে? আমার চোখ আর্দ্র হয় আর মনে পড়ে আম্মার কথা। নলিনী ডাক্তার যখন আমার মৃত্যু নিশ্চিত বলে ভেবেছিলেন, তখনও আমার মনে হয়েছিল, মাকে জীবিত রেখে সন্তানের মরে যাওয়া খুব অন্যায়। আজ রেণুর জন্য তার চেয়ে অনেক বেশি দুঃখ হচ্ছে। আমি আম্মার দিকে চাই। জননী আমার সেজদারত। আমাদের পরিবারের মধ্যেই এমন একটা গল্প কোথায় যেন শুনেছিলাম। ওটা গল্পই ছিল। সেটা যেন কেউ আজকের কথা কল্পনা করে বানিয়েছিল।

জননীর প্রার্থনা কি আমাকে বার বার বাঁচিয়ে দেবে? রেণুর আশঙ্কা ততক্ষণে আমার মধ্যেও ছড়িয়ে গেছে। আমারও মনে হচ্ছিল, রমাপদ বাবু মরে গেছেন। আমার ফাঁসি হবে।

"আমাদের কি এক সাথে ফাঁসি দেয়ার কোনও ব্যবস্থা করতে পারবেন?" রেণু বলে। "আপনি যদি তাদের বলেন।"

আমি রেণুর দিকে তাকাই আর আমার বাক্ রুদ্ধ হয়ে যায়। রেণুও কোনও কথা বলে না। সে বুঝি আমার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে। রেণু যা বলল আমি কি তা ঠিক মতো বুঝতে পারলাম? আমি রেণুকে কিছু প্রশ্ন করি। দেখি, রেণু কোনও ভুল করেনি। ও একই কথা কয়েক বার বলল। আমি ওকে প্রশ্ন করা বন্ধ করি।

রেণুর গলায় কী ছিল জানি না। বাস্তবতার কথা ভেবে আমি গলা নরম করে বলি, "রেণু, পৃথিবীতে এই নিয়ম। মানুষ মরে যায়, তারপরও তার আপনজনরা বেঁচে থাকে। আর এক সময় তাঁদের দুঃখটাও সয়ে আসে।"

"আমি জানি," রেণু বলে। "কিন্তু আপনি আমার কথা বুঝবেন না।"

"আমি বুঝব, রেণু। তুমি বলো।"

"আমি আপনার সাথে থাকতে চাই। আপনি যেখানে থাকবেন আমি সেখানে। আপনি জেলখানায়, আমিও জেলখানায়। আপনার ফাঁসি, আমারও ফাঁসি। আপনি কবরে, আমিও কবরে। আপনি বুঝলেন আমি কী চাই?"

আজকে, যখন আমি রেণুর সাথে বাসর যাপনের প্রস্তুতি নিচ্ছি, তখন রেণুর সাথে সহমরণের কথা ভেবে আমি বিব্রত হচ্ছি। অথচ এই আকাঙ্ক্ষাটা চার বছর আগে রেণুই আমাকে ধার দিয়েছিল। আমাদের দু'জনের অপার্থিব আত্মিক সম্পর্ক তখনই রচনা হয়ে গিয়েছিল। সহমরণ, এক সাথে পাশাপাশি দুটি কবর। প্রথমটা সম্ভব না হলেও, দ্বিতীয়টাতো খুবই সম্ভব। হয়তো অনেকগুলি বছর একাকি কাটবে। তারপর রেণুর কবর হবে আমার কবরের পাশে। অবশ্য বিপরীতটাও হতে পারে। সব কিছুতো আল্লাহর হাতে।

তখন আমার মনের জোরটা আবার ফিরে আসে। আমি সিদ্ধান্ত নিই রেণুকে আমি কিছুতেই একা হতে দেব না। এবার মাথায় বুদ্ধিও আসে। সিদ্ধান্ত নিই আমি রেণুকে নিয়ে পালিয়ে যাব। হ্যাঁ আমি তা-ই করব। আমার সক্রিয় মস্তিষ্ক শুধু একটা নয়, একশটা উপায় খুঁজে বের করে।

আমি আর রেণু চলে যাব যে কোনও জঙ্গলে। গাছের ছাল আর পাতার পোশাক পরে জীবন কাটাব। ডুমুর আর চালতা খেয়ে বেঁচে থাকব। চলে যাব এমন জায়গায় যেখানে আমাদের পুলিশ খুঁজে পাবে না। যেখানে আমি আর রেণু থাকব। রেণুর অনেক কষ্ট হবে। তবু খেয়াল রাখব যাতে বর্ষার কাদা, সাপের কাঁটা, কিংবা শামুকের খোসা ওর পায়ে ক্ষত সৃষ্টি করতে না পারে। অন্তত সুন্দরবনেতো পালিয়ে যেতে পারি, যা এত কাছে। কাঠ কেটে সংসার

চালাব। জঙ্গলে বাঘ আর সিংহের সাথে বন্ধুত্ব পাতাব। রেণুর জন্য আমাকে একটা কিছু করতেই হবে। দেশ সেবা কিংবা রাজনীতি, সব কিছু আমার কাছে তুচ্ছ মনে হয়। আমি রেণুকে আমার মনের কথা খুলে বলি।

"তা কি সম্ভব?" রেণু বলে। "আমি চারিদিকে নদী আর খাল ছাড়া কিছু দেখিনি।"

রেণুর বাস্তববাদী চিন্তা আমাকেও বাস্তবে ঠেলে দেয়। আমি বুঝতে পারি, রাতের অন্ধকারের ওসব চিন্তা সূর্যোদয়ের সাথে সাথে পাগলামি মনে হবে। তারপরও ভাবি, এক বার খাল পর্যন্ত গেলে অনেক নৌকা পাব। যে কোনও একটা নৌকা নিয়ে ঢাকার দিকে রওয়ানা দেয়া যায়। একটা চুম্বক থাকলে ভালো হতো। চুম্বক নেই, কিন্তু সূর্য বা চন্দ্রতো থাকবে। নৌকা যাতে দক্ষিণে না যায়, তা খেয়াল রাখবে রেণু। দক্ষিণে গেলে আমরা বঙ্গোপসাগরে পড়ে যাব। খোলা দ্বীপ কিংবা সুন্দরবনে বসবাস পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়। বরং ঢাকা-ফেনী-চট্টগ্রাম হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ে চলে গেলে ভালো হয়। বান্দরবানের উপজাতিদের সাথে মিশে গেলে কেউ আর কখনও আমাদের খুঁজে পাবে না। অনেকক্ষণ ধরে রেণুকে তা বুঝাই।

রেণু আমার কথা শুনে দুঃখের হাসি হাসে। নিজেকে আমার শিশু মনে হয়।

"আমার আরও কিছু কথা ছিল," রেণু বলে।

বলো, গলা ফাটিয়ে বলতে চাই। বলতে পারি না।

"ফাঁসি হলে আপনি মরেই যাবেন, তাই না? বাঁচার কি কোনও সম্ভাবনা আছে?"

"না, রেণু। ফাঁসি দেওয়া হয় মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য। এখানে কোনও ফাঁকি চলে না।"

"পুলিশ কি আপনাকে সময় দিবে, আমাকে দুইটা সাদা শাড়ি কিনে দিতে?"

"কি বললে, রেণু।"

কোনও উত্তর নাই।

"কি বললে? কি বললে? আর একবার বলো।"

"মনে হয় কথাগুলো বলা দরকার।"

"কি কথা?"

"দুইটা সাদা শাড়ি।"

সেজদারত আমার জননী ফুঁপিয়ে ওঠেন। আমি বুঝলাম উনি রেণুর কথা শুনে আর কান্না ধরে রাখতে পারলেন না। জননীর কান্নার আছর পড়ে আমার উপর। আমিও চোখের পানি ছেড়ে দিই। রেণু একের পর এক পুরুষকে মরতে দেখেছে। দেখেছে তাদের নারীরা সাদা শাড়ি পরে। আমি কেঁদে কেঁদে বুক হালকা করি। এ ছাড়া আর কী করতে পারি? রেণু, আম্মা, আমি তোমাদের কত ভালোবাসি।

কাটাইলের চামড়া তুলে নিব আমরা।
কাটাইলের চামড়া তুলে নিব আমরা।
একটা একটা কাটাইল ধর। সকাল বিকাল নাস্তা কর।
কাটাইলের চামড়া তুলে নিব আমরা।
বাংলার কাটাইল।
নিপাত যাক নিপাত যাক।

আমি মিছিলের আওয়াজ শুনি। জানালা দিয়ে সবে মাত্র ক্ষীণ আলো দেখা দিয়েছে। মেঝেতে পাটির উপর আম্মা আর রেণু ঘুমাচ্ছে। আম্মা নিশ্চয়ই ফজরের নামাজ পড়ে ঘুমিয়েছেন। মিছিলের আওয়াজ স্পষ্টতর হতে থাকে। মাদারীপুরের সেই ইংরেজবিরোধী মিছিলটার কথা মনে পড়ে। সেটা ছিল আমার জীবনের প্রথম মিছিল। এর পর অনেক মিছিল করেছি। ইংরেজের বিরুদ্ধে। সাম্প্রদায়িতকার বিরুদ্ধে। এখন শুনছি সাম্প্রদায়িক মিছিলের আওয়াজ।

আমার মাথা ঠাণ্ডা। বিপদ একটা আসছে। আমি ভাবছিলাম, কি করলে সবচেয়ে ভালো হয়। যুদ্ধ করে দুই পক্ষ। যে পক্ষ জিতে সে তো উদযাপন করে। যে পক্ষ হারে তার কি গলায় দড়ি দেয়া উচিত?

দেখলাম, আমি যখনই বিপদটাকে মেনে নিচ্ছি, তখন শান্তি পাচ্ছি। আবার যখন ভাবছি অন্য কিছু করব, তখন মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। আমি এক বার মেনে নিই, এক বার নিই না। শেষ পর্যন্ত আমি বিপদকে মেনে নিই। কারণ ওই সময় শান্তি ছাড়া আমার আর কিছু আশা করার ছিল না। আমি গ্রহণের শান্তিতে অবগাহন করি। আমার মনে আর কোনও সন্দেহ নাই যে রমাপদ বাবু মারা গেছেন।

মিছিলটা আমাদের বাড়ির দিকে ক্রম-অগ্রসমরমান। যে কথাগুলো স্পষ্ট

শুনতে পাচ্ছি, তা আমার কান গরম করে দিতে থাকে। ওরা আমার আম্মাকে গালি দিচ্ছে। এর চেয়ে কুৎসিত গালি আর হওয়া সম্ভব নয়। এক দিন আগেও যদি এর চেয়ে দশগুণ কম অশিষ্ট গালি শুনতাম, আমি তার প্রতিবাদ করতাম। আর এখন আমার কিছু করার মতো অবস্থা নাই।

রেণু একটু নড়ে ওঠে। আমি চাচ্ছিলাম ও আরাম করে ঘুমোক। কিন্তু রেণু আবার নড়ে ওঠে। তারপর রেণু একটা ঝাঁকুনি দেয়। আমি দেখি রেণু কাঁপে। ওর মুখ বন্ধ কিন্তু গলায় চাপা আর্তনাদ। আম্মা লাফ দিয়ে ওঠেন। কী করব বুঝতে পারি না। তাই আমি গিয়ে আম্মার পাশে বসি। আম্মা দুই হাত রেণুর দুই ঘাড়ের উপর রাখেন। রেণু অনেক বেশি কাঁপছে।

"কী হলো, রেণু? আমি বলি।

কী হল, আব্বা?" আম্মা বলেন।

আম্মা রেণুকে একটু চেপে ধরেন। কিন্তু ওর কাঁপন বন্ধ হয় না। আম্মা রেণুকে হালকা ঝাঁকুনি দেন।

"কী হয়েছে, বাবা? শুনতে পাচ্ছিস, আব্বা?" আম্মা বলেন।

রেণুর কাঁপন কিছুটা থামে। তারপরও আম্মা ওকে নড়াতে থাকেন। কষ্টে আমার বুক খুব উঠানামা করে। এক বার মনে করলাম, ভেতর থেকে যা আসতে চাইছে, আসতে দিই। কান্নার স্রোত। কিন্তু এত অল্প সময়ে কতবার কাঁদব? তাই আমি তা আটকে রাখি। আম্মা রেণুর দুই বাহু ধরে টানেন।

আমি কী আমাতে আছি? আমি নিজেকে প্রশ্ন করি। কারণ কখন কীভাবে রেণু উঠে আম্মার গলা জড়িয়ে ধরেছে আমি তার কিছুই বুঝতে পারিনি। ব্যাপারটা খুব দ্রুত ঘটে যায়। যখন আমি কিছুটা সুস্থির হই, তখন আমার ঠাহর হয়, রেণু আম্মার বুকের মধ্যে কাঁপছে। কখনওই আমি ওকে এমন ভাবে ফোঁপাতে দেখিনি। আম্মা রেণুকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে রাখেন। তাতে কাজ হয়। খুব ধীরে ধীরে। আমি আল্লাহ আল্লাহ করি। রেণুর শরীরটা আস্তে আস্তে স্থির হতে থাকে।

রেণু নিস্তরঙ্গ হয়। আমি আম্মার দিকে তাকাই। তারপর বুঝতে পারি, আম্মার গলা বেয়ে এক ফোঁটা এক ফোঁটা করে রেণুর অশ্রু নিচে নামছে। রেণু আম্মাকে এমন ভাবে আকঁড়ে ধরে আছে, আম্মার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল।

"কী হয়েছে, কী হয়েছে, রেণু?" আমি বলি।

"ওরা আপনাকে মেরে ফেলেছে।"

"আমাকেতো কেউ মারেনি।"

"মেরে ফেলেছে।"

"তারপর?"

রেণু কিছু বলে না।

"তারপর তোমার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল?"

"না।"

"আম্মা তোমাকে জাগিয়ে দিলেন?"

"না।"

"আমাকে মেরে ফেললে আমি এখানে আছি কী করে, রেণু?"

"আপনি বুঝবেন না।"

"তুমি সব সময় একই কথা বল।"

"কারণ আমি আপনাকে বুঝাতে পারি না।"

"আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি যে ভাবে পারো সে ভাবে বলো। আমি বুঝব।"

"আমি আপনাকে আর কিছু বলব না।"

রেণু আম্মাকে আরও দৃঢ় ভাবে আঁকড়ে ধরে।

গত চার বছরে রেণুকে ওর সেই দুঃস্বপ্নের কথা খুব বেশি জিজ্ঞাসা করা হয়নি। অবশ্য দু'একবার ও আমাকে বলেছে, আমি যতটা ভেবেছি, ওর স্বপ্নটা নাকি ততটা খারাপ ছিল না। ও ভয় পেয়েছিল সত্যি, তবে স্বপ্নের ঘটনাগুলো না কি অনেক জটিল, এবং আমি তা বুঝব না, তাই সে আমাকে বলতে চায় না। আমিও পরে আর কথাটা বেশি তুলিনি। যদিও আমার সব সময় মনে হয়েছে, ওর স্বপ্নটার মধ্যে গূঢ় কিছু ছিল। যা ওকে বিব্রত করেছে। তাই সে তা বলতে চায় না। আর এখন, চার বছর পর মনে হচ্ছে, সত্যি ওর সেই স্বপ্নে গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ ছিল, যা বললে হয়তো আমরা হাসাহাসি করতাম। তাই সে কাউকে তা বলেনি। দেখি, আমি ভাবি, বাসরের সময় ওকে আর একবার সেই স্বপ্নের কথা জিজ্ঞেস করব।

আমি বিপদের জন্য অপেক্ষা করি। যখন দরজায় কড়া নড়ে তখন ভাবি অতিথি এসেছে। দরজার ছিটকিনি খোলাই ছিল। তাই বুঝলাম বাড়ির কেউ, পুলিশ নয়। আব্বা কী চলে এলেন? আমি দরজা খুলে দেখি হাবু শেখ একটা কিরিচ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বারান্দায় পড়া সূর্যের আলোতে কিরিচটা চকচক করে। মনে হয় হাবু শেখ ওটা শান দিয়ে তবে এনেছেন।

"কিছু শুনলেন, চাচা?"

"হ মরছে।"

"এখন কি হবে?"

"তুমি এ ঘর থেকে বার হবা না। কেউ আসলে আমি মাথা উড়িয়ে দেব।" হাবু চাচা তাঁর কিরিচটা মাথার উপর তুলে ধরেন। "আমাদের কাটাইল বলে গালি দেয়," হাবু শেখ বলেন। "মাথা ঠান্ডা রাখতে পারি না, বাবা মজিবর।"

আমি বুঝলাম, হাবু চাচাও সাম্প্রদায়িক জ্বরে আক্রান্ত।

"চাচা, আপনি কীভাবে জানেন রমাপদ বাবু মারা গেছেন।"

"আমার মন বলছে। না, আমার মন চাইছে। আর তা ছাড়া, দেখছ না শহরে কেমন উত্তেজনা। তুমি ঘরের বার হবা না।"

কিরিচটা খাটের পায়ের কাছে হেলান দিয়ে রেখে হাবু শেখ হারিকেনগুলো নিভান। জানালার পর্দা সরিয়ে দেন। জানালার বাইরে একটা লেবু গাছ। গাছটাতে নতুন পাতা ধরেছে। আমি কয়েকটা হলুদ লেবু দেখি। একটা কাঠবিড়ালি আমগাছের ডাল আর কাণ্ড বেয়ে নিচে নেমে মাটিতে গড়াগড়ি খায়। আহা! সব কিছু কত মনোমুগ্ধকর।

আমি গোসলখানায় ঢুকে হাতমুখ ধুই। হাতের ব্যথাটা এখন আর নেই। আম্মা উঠে পাকঘরে যান। হাবু চাচা দুটি প্লেটে আমাদের জন্য কলা, দই,

আর চিড়া ভেজা নিয়ে আসেন। রেণুও উঠে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে আসে। আমি পেট ভরে খাই। চম্পা কলার সুগন্ধে আহারের তৃপ্তি বাড়ে। রেণু অনেক পানি খায়। আম্মা আর রেণু যে রাতে কিছু খায়নি, তা এতক্ষণে আমার মনে এল।

আব্বা, নাসের আর আমার ফুফাত ভাই জগলু আমার ঘরে ঢোকে। নাসের বেশ আতঙ্কগ্রস্ত। আমি কানে উত্তাপ অনুভব করি। গত বিকালের ঘটনার পর এটাই হতে যাচ্ছে সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। রেণু মোড়া থেকে উঠে দাঁড়ায়। আমি কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে বসে থাকি। তারপর না নড়ে একবার আব্বার দিকে এক বার জগলুর দিকে চাই। আব্বার মুখ উদ্বেগের ঘামে তৈলাক্ত। তবে তাঁর শরীরের বাড়িতে ঘরের বাতাস এখন অনেকটাই হালকা।

মাসখানেক জগলু টুঙ্গিপাড়া ছিল। সে গোপালগঞ্জে আমাদের সাথে থাকে আর এখানে স্কুলে পড়ে। আব্বার পাশাপাশি জগলুরও চোখ দুটি বড় আর গোল হয়ে আছে। বুঝলাম, আব্বা নিজের ঘরে না গিয়ে সরাসরি আমার ঘরে এসেছেন। হাবু শেখ আব্বার ব্যাগটা নিয়ে যান। আব্বা একটা চেয়ারে বসে আমার দিকে চান। আমার কষ্ট হয় যখন দেখি আব্বা নিজেকে সামলে নিয়েছেন। তিনি পথে সব শুনে এসেছেন নিশ্চয়ই। এখন ছেলের জীবনাবসানের আশঙ্কায় ছেলের প্রতি রাগও করতে পারছেন না। সবেগে তেড়ে আসা একটা নিশ্বাস আমি জোর করে থামাই। কত কষ্ট দিচ্ছি আমার আব্বাকে।

"দেখো, খোকা, এখন নিজ হাতে তোমাকে শাস্তি দিব, সে বয়স তোমার নাই।"

আব্বা এই কথা বলে থেমে যান। আমি চাইছিলাম তিনি কথা বলুন, না হয় বকা দিন। কিন্তু আব্বা আর কিছু বলেন না। আম্মা ফিরে আসেন। আম্মা আর রেণু পাটিটা তুলে নেয়। আমি আড়চোখে আব্বার দিকে চাই। আর অনুভব করি আমার উদরের পেশি কিছুটা শিথিল হয়। কোথাও যেন একটা আশার আলো দেখি।

"আব্বা, রমাপদ বাবু কি মারা গেছেন?"

"না। তবে মামলা হয়েছে।"

আমি শরীরটা পুরোপুরি ছেড়ে দিই। বুক ভরে শ্বাস নিই। মন হয় এই মাত্র ঘাম দিয়ে একশ সাত ডিগ্রির জ্বর আমার দেহ থেকে এক নিমেষে বের হয়ে গেল।

"আল্লাহ, তুমি মেহেরবান," আমার আম্মা বলেন।

রাতভর শাস্তি পেয়েছি, সেটা ঠিক। জীবনটা যে বাঁচল, সেটাই বড় কথা। আমি ভাবি, এত মামুলি কারণে জীবন হারানো দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছুই হতো না। আমি স্বাধীনতা আনার স্বপ্ন দেখি। আমার সেই আশার মৃত্যু হলো না, এটা আমার কাছে অনেক বড় একটা ব্যাপার। তার চেয়েও বড় ব্যাপার রেণু একা হলো না। মামলা হয়েছে তো কী হয়েছে? অনেক ঝামেলা আছে সামনে। তবে যে আশঙ্কা করেছিলাম, তা যদি সত্যি হতো, সবতো শেষ হয়ে যেত।

প্রত্যেক শনিবার আব্বা নিজের নৌকা করে বাড়ি যান আর প্রত্যেক সোমবার চৌদ্দ মাইল নৌকায় চড়ে ভোরবেলা গোপালগঞ্জ ফিরে আসেন কাজে যাওয়ার জন্য। আজকে আর তাঁর কাজে যাওয়া হবে না।

"খোকা, তোমার কারণে অনেক খুনখারাপি হয়ে যেতে পারে। সারা শহরে উত্তেজনা। হিন্দুরা দা, ছেনি, তলোয়ার নিয়ে রাস্তায় মিছিল করছে। মুসলিম লীগ, কংগ্রেস, হিন্দুমহাসভার লাগানো আগুন। তুমি ছোট মানুষ, তুমি এগুলো মিটাতে পারবে না।"

"চেষ্টাতো করতে পারি, আব্বা।"

আমি আর আব্বা কথা বলি। আব্বার সামনে আমাকে সব সময় ভেবেচিন্তে কথা বলতে হয়। রেণু আব্বার জন্য নাস্তা এনে টিপাইয়ের উপর রাখে। আমরা যা খেয়েছি তা-ই। সাথে এক কাপ চা। জগলু আর নাসের রান্নাঘরে গিয়ে খেয়ে এসেছে। আব্বা রেণুর মাথায় হাত রেখে আদর করেন। রেণু এক পলক আমার দিকে চায়।

"আমাদের কি হবে, মামা?" জগলু বলে। "দেখেন রেণু ভাবি কেমন ভয় পেয়েছে।"

"আমি ভয় পাইনি," রেণু বলে।

"হিন্দু নেতারা রাতে বসে হিন্দু অফিসারদের সাথে পরামর্শ করে এজাহার ঠিক করেছে," আব্বা বলেন। "আমাকে এজাহার দেখানো হয়েছে। মোক্তার সাহেব হুকুমের আসামি। তুমি খুন করার চেষ্টা করেছো। লুটপাট দাঙ্গাহাঙ্গামা লাগিয়ে দিয়েছ। অনেককে আসামি করেছে। কোনও গণ্যমান্য লোকের ছেলেকে বাকি রাখে নাই।"

"এটাতো আরও বেশি অন্যায়, আব্বা। আমরা মাত্র আট জন ছিলাম।"

"সবাইকে গ্রেফতার করা হয়ে গেছে। শুধু তুমি বাকি আছো।"

"এত তাড়াতাড়ি গ্রেফতার হয়ে গেল সবাই?"

তাতো হবেই, আমি মনে মনে বলি। প্রশাসনের কর্তারা প্রায় সবাই হিন্দু।

"ওনার কি ফাঁসি হবে না?" রেণু বলে।

আব্বার কটাক্ষ রেণুর উপর পড়ে। রেণু এমন প্রশ্ন করতে পারে আব্বা বোধ হয় ভাবতে পারেননি। ধীরে ধীরে তাঁর চোখ দু'টি নরম হয়। রেণুর

হাত দুটি আব্বা তাঁর মুঠোর মধ্যে নেন।

"বউমা, তুমি কবে বড় হবে?"

"আমি এখনই সব করতে পারি," রেণু বলে।

রেণুর দিকে তাকিয়ে আব্বার চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাঁর ওই স্মিতহাস্যের কী মূল্য তা আমরা সবাই জানি। আব্বা রেণুকে নিজের কাছে টেনে নেন।

"আল্লাহর কাছে দোয়া করি, বউমা, তিনি যেন তোমাকে অনেক শক্তি দেন।"

আব্বা রেণুর সাথে ওর ছোট বেলার কথা বলেন। ওর পিতামাতার কথা বলেন। "আমি তোমার সম্পত্তির জিম্মাদার, বউমা। কিন্তু সম্পত্তি তোমার। তোমার কোনও চিন্তা নাই।"

আব্বা আর রেণু যেন সমানে সমান। আগে কখনও এমনটা দেখিনি। ওদের দুজনকে দেখে বুঝি, মানুষের জীবনে পারিবারিক বন্ধনের মূল্য কী। আমার কী হতে যাচ্ছে তা রেণু আব্বাকে কয়েকবার জিজ্ঞাসা করে।

"খোকার ফাঁসি হবে না," আব্বা বলেন। "তবে কিছু দিন জেল হবে।"

রেণু জানে রমাপদ বাবু বেঁচে আছেন। তবু ওর মনে আমার ফাঁসির আশঙ্কা কেন জানি না।

"কত দিন?" রেণু বলে।

আব্বার মুখ পুনরায় চিন্তাক্লিষ্ট দেখায়। "চেষ্টা করব, তাড়াতাড়ি বের করে আনতে।"

আম্মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। আম্মার পাশে নাসের বসে আছে। ওর বয়স মাত্র দশ বছর। তবু মনে হয় ও ভাইকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। আমি নাসেরের দুর্বল পা'টার দিকে তাকাই। ভাইয়ের জন্য আমার গর্ব হয়, আবার কষ্টও হয়।

আমি কয়েকদিন জেল খাটার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাই। এত অল্পতে যে সারল, সেটাই আমার মাথায় বার বার ঘুরপাক খায়। পূর্ববর্তী দিন সন্ধ্যা থেকে রেণু শক্ত হয়ে ছিল। ও এখন স্বাভাবিক হয়েছে।

"দারোগা সাহেব বাইরের ঘরে বসে আছেন," আব্বা বলেন। "আমাকে তোমার গ্রেফতারি পরোয়ানা দেখিয়েছেন।"

সেই দারোগা সাহেব। যিনি আমাকে সাবধান করে দিতে এসেছিলেন। তবে তাঁকে মোকাবেলা করা আব্বাকে মোকাবেলা করার চেয়ে সহজ হবে। আমি শুধু আব্বার কথা ভাবছিলাম। গোপালগঞ্জের সব লোক আব্বাকে চেনেন। আব্বা সেরেস্তাদার হলেও আব্বাকে কেউ জজ ব্যারিস্টারের চেয়ে কম সম্মান দেন না। আব্বা এক কথার মানুষ। শহরের সব সামাজিক কাজেই তাঁর অংশগ্রহণ থাকে। দারোগা সাহেব আব্বার বন্ধু। আব্বাকে সবার কাছে আর এক বার বিব্রত করলাম।

"মিয়া ভাই, পাশের বাসায় একটু সরে যাও না," জগলু বলে।

"আমি পালাব না।"

রেণু আমার মুখের দিকে চায়।

"ফাঁসি না হলে আর কোনও সমস্যা নাই," রেণু বলে।

"দারোগা সাহেবও চায় তুমি পালিয়ে যাও," আব্বা বলেন। "বেচারা লজ্জা পাচ্ছে তোমাকে গ্রেফতার করতে।"

টাউন হলের কাছে আমাদের বাড়ি হলেও পিছন দিকে একটা গেট আছে। আমি চাইলে পালিয়ে যেতে পারি।

"আব্বা, আপনি কি চান আমি পালাই?"

"আমি চাই বা না চাই, আমি জানি তুমি পালাবে না," আব্বা বলেন।

আব্বা বুঝিয়ে দিলেন আমরা শেখরা লড়াইয়ের জাত, পালানোর জাত না। আমি মনে মনে বলি, যার এমন পিতা আছে, সে বীর হবে, এটাই নিয়ম। আমি যদি তা হতে না পারি, সেটা আমার ব্যর্থতা হবে, আমার পিতার নয়।

আব্বা, আম্মা, রেণু, নাসের আর আমি বাইরের ঘরে আসি। দারোগা সাহেব সিগারেট আর পান খাচ্ছেন। টেবিলের উপর খালি করা তস্তরিগুলো দেখে বুঝতে পারি, আম্মা হাবু শেখকে দিয়ে ওনাকে অনেক নাস্তা খাইয়েছেন।

"নিয়ে যান," আব্বা বলেন।

"ও খেয়েদেয়ে আসুক," দারোগা সাহেব বলেন। "আমি একজন সিপাহী রেখে যাচ্ছি, এগারোটার মধ্যে যেন থানায় পৌঁছে যায়। দেরি হলে জামিন পেতে অসুবিধা হবে।"

আমি ডিম আর মসুর ডালের তরকারি দিয়ে ভাত খেয়ে থানায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হই। পাঁচ বছর বয়সে আব্বা আর আম্মার সাহস দেখেছিলাম। আজ দেখি রেণুর সাহস। আমি বলি, রেণু, যেতে হবে। রেণু বলে, যান।

"কত দিনের জন্য যাচ্ছি, জানি না, রেণু।"

"আপনার ফাঁসি হবে না," রেণু বলল। "তবে কিছু একটা হবে।"

আম্মা রেণুকে বুকে টেনে নেন। রেণুর চোখের দিকে চেয়ে আমার হাঁটু দু'টি কাঁপে। এখন আর কোনও সন্দেহ থাকে না যে রেণুর মনে কিছু একটা